জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

আধ্যাত্মিকতার গোপন কথা

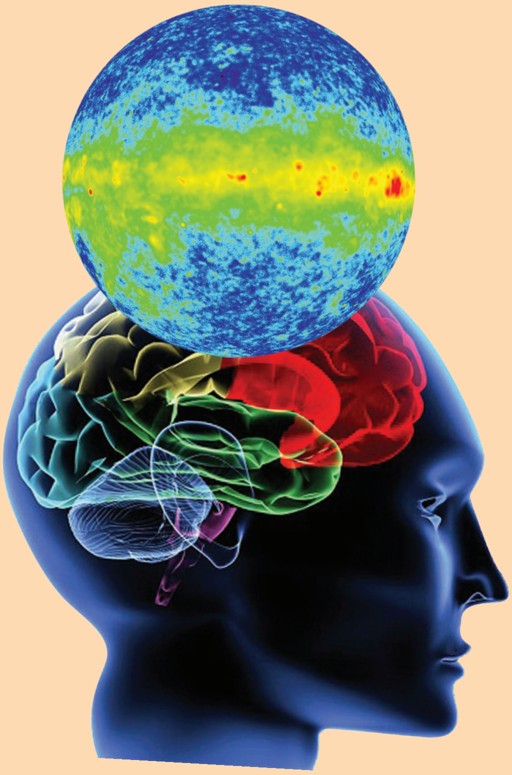

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

আধ্যাত্মিকতার গোপন কথা

প্রকাশনায়
সন্ধান লুঙ্গী
কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

আধ্যাত্মিকতার গোপন কথা - ২

প্রকাশক : দরবার শরীফ
পক্ষে- মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু)
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৫১০০৫৯

স্বত্ব : মুক্ত

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২১ ইং

প্রথম প্রকাশ : ২৫ শে আগস্ট ২০২১ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০২৫ইং (পরিবর্ধন-পরিমার্জন সংযুক্ত)

প্রচ্ছদ : বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

বর্ণবিন্যাস : মোঃ সুজন

মুদ্রণ : মমিন অফসেট প্রেস, রাজা হাজী মার্কেট, পাবনা।

মূল্য : ২২০ (দুইশত বিশ টাকা)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।

Web: www.babadeloyer.com

YouTube **Baba Deloyer**

* অবতরণিকা *

ঘোর নুরে চোর জন্ম ডাকু রাহাজান

ধীর নুরে মুনি জন্ম আর মাহাজন

যে জন এসব গুন করি বে সাধন

নিজ গুনে গুনি সেই কর নিরুপন”

(জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী)

পবিত্র এই বানী দ্বারা শুরু করিলাম। নূরে মোহাম্মদী হতেই সকল সৃষ্টির প্রকাশ ও বিকাশময় ধারা চলমান। তন্মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকশিত রূপ হল মানব জগত। যাকে বলা হয় “আশরাফুল মাখলুকাত” অর্থ সৃষ্টির সেরা। আর সেরা প্রবর্তক বা মহা মানব আল্লাহর সব চাইতে প্রিয় হাবিব কে সর্বশেষ অবতরণ করাইয়াছেন। তাঁর দেহ ত্যাগের পর, মানব মুক্তির পথ বিভিন্ন ভাগে বিভাজন হতে শুরু করেছে। চলমান ধর্মীয় ব্যবস্থা পত্রে মানুষের আশ্রয়স্থল হল মোল্লা মুফতির শরণাপন্ন হওয়া। তাদের দেওয়া জীবন বিধান হল হাশর, নশর, কবর, জান্নাত, জাহান্নাম, মিজানের পাল্লা, বিচার-আচার, আজাব সবই মৃত্যুর পরে। কিন্তু সুফি মতের আলোকে উল্লেখিত বিষয় সমূহ বাস্তব এবং মানব জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত বা অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত। তারই আলোকে হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) এর দেখানো বিধি বিধান যা সম্পর্কে মানুষকে খুব কমই অবহিত করা হয়েছে। সেই আঙ্গিকে দুলর্ভ কিছু বিষয় আলোচনাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বইটিতে। যেমন তাসাউফ সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে এবং মাধুর্যময় আলোচনা হয়েছে।

তৎসংগে আহালুস সুফফা একটি আদর্শ ভিত্তিক চরিত্র গঠনের দৃষ্টান্ত। যারা হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের বিষয়ে আসল নির্যাষ টুকু উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মহান স্রষ্টার বিকাশ ও প্রকাশময় ব্যবস্থা পত্রের সহিত সরাসরী জড়িত “রুহ” এবং নফস এই দুটো বিষয় অত্যান্ত সহজ ভাবে পাঠক কুলকে অবহিত করার মানসে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে মহান আল্লাহ দোষমুক্ত সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত ধর্মবিদগণের মত ও পথ এবং সুফিদের মত ও পথ বিষয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কোরান, হাদিস এবং মহা-মানবদের বাণী সমূহ উল্লেখ পূর্বক সকল ধোঁয়া আর কুয়াশা সত্য লাভে বন্ধন হতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করছি। নতুন এই গ্রন্থটিতে মানুষের অনেক প্রশ্নের সহজ সমাধান হবে। বিভ্রান্ত মতবাদ, চোখে কালো কাপড় দ্বারা সত্যের মানদন্ড লাভে ধর্মের দোহাই থেকে উত্তরণ, স্বাধীন-স্বত্ত্বার প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষ কি ভাবে মূল ধারার দিকে ধাবিত হবে তারাই আলোকবর্তিকা হিসাবে জ্ঞান সঞ্চালনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে কিছু মানুষ ধর্মের অঙ্গিকে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে অবহিত হলে নিজের স্বাধীন সত্ত্বার ও জ্ঞান কে কাজে লাগিয়ে মহান স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্যে যাবার মত ও পথের দিশা সম্পর্কে অবগত হবে। তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কিছুটা তৃপ্তিবোধ করবে। “নিজেকে জানো” এই আহবান টুকু রেখে শেষ করছি।

সকল পাঠক বাবা-মায়ের মঙ্গল কামনায়

(বাবা দেলোয়ার)

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

জনাব শাহ সুফি মাওলানা হাবিবুল বাসার আল সুরেশ্বরী হবিগঞ্জ, সিলেট। গুরু ঘরের অধিবাসী, আমার সুফিমতের পথ চলার একজন দিশা দানকারী। আপদ কালিন সময়ে তার আশ্রয় ও সহবতের মাধ্যমে একান্ত স্মৃতি গুলো কখনও ভুলতে পারি না। তিনি প্রায়ই বলতেন যত অল্প ব্যয়ে আপনি চলতে পারবেন ততই আপনি সুফি ধারাকে আয়ত্বে রাখতে পারবেন। আমার মত ভোজন রসিক অর্বাচিন কিসেমের ব্যক্তিকে উনি যে ভাবে বুকে তুলেছেন তা স্মরণ করলে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। তাই নিজের স্মৃতিতে একটু স্মরণীয় করে রাখতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা । দয়াল সহায় হউন।

শাহ-সুফি মাওলানা হাবিবুল বাসার আল-সুরেশ্বরীর পবিত্র হস্ত মোবারকে বইটি উৎসর্গ করিলাম।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রিত অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবে না। কারণ এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে স্বজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতি সত্ত্বার অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে পরিবেন।

-: আলোচ্য বিষয়গুলো যে ভাবে সাজানো হয়েছে :-

(আলোচনার বিষয় সমূহ) **(পৃষ্ঠা নং)**

০১। তাসাউফ	০৮
০২। আহ্‌লে সুফফা বা আসহাবে সুফফা	২৫
০৩। রুহ বিষয়ে আলোচনা	৩২
০৪। মহান আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরাআনুল মাজিদে রুহ সম্পর্কে উল্লেখ নিম্নরূপ :-	৩৩
০৫। রুহ সম্পর্কিত আয়াতের উপর আলোচনা	৩৯
০৬। নফস সম্পর্কে উল্লেখ	৬৩
০৭। নফসের প্রকার ভেদ	৬৮
০৮। নফসে আম্মারা	৬৮
০৯। নফসে লাউয়ামা	৬৯
১০। নফসে মুৎমাইন্না	৭২
১১। নফসে মূলহেমার	৭৪
১২। নফসে রহমানিয়া	৭৭
১৩। আল্লাহ কি দোষ মুক্ত নয় ?	৭৮
১৪। মওলা আলী (আঃ) পদত্ত খোৎবা	৮৩
১৫। চেরাগে জান শরীফ (সূরা লাহাব অনুবাদ)	৮৬
১৬। ধর্মের লেবাসে, ঘোমটার জ্ঞানে	৯৪
১৭। শাহ সুফি বাবা শরীফ আল জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীরর অবয়বকে স্মৃতির পাতায় তুলে রাখলাম	৯৭
১৮। দাগী (রবিউল আওয়াল উপলক্ষে)	৯৮
১৯। গান (আব্দুল গাফফার এর রচনাবালী)	৯৯

তাসাউফ

তাসাউফ আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মবাদ, সুফিবাদ। মুসলিম দর্শনে তাসাউফ সুফিবাদ হিসাবেই খ্যাত। সুফ শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ পশম, পশমী বস্তু। মূলত সরলতা ও আড়ম্বরহীনতারই প্রতীক রূপে প্রতিয়মান। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সাহাবীগণ বিলাসীতার পরিবর্তে সাদাসিধে বা সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সেই আলোকেই সাদাসিধে এবং সাধারণ জীবন যাপনকারী ব্যক্তিকে মুসলিম দর্শনে সুফি নামে অভিহিত করা হয়।

মানব জীবনের দুইটি দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক বা প্রকাশ্য এবং অপরটি হলো আত্মিক বা অপ্রকাশ্য দিক। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে, যা শরিয়াত নামে পরিচিত। অপর দিকে মানুষের আত্মিক বা অদৃশ্য দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যও নীতি-আদর্শ রয়েছে, তা হলো তাসাউফ। মানুষের কেবল বাহ্যিক দিক পরিচালনা হবে ইসলামী জীবন বিধানে, আর অন্তর পরিচালিত হবে নিজের ইচ্ছা মাফিক তা ইসলাম সমর্থন করে না। মানুষের অন্তর নিয়ন্ত্রণ, পরিশোধন পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইহার প্রচলিত নাম হলো তাসাউফ।

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর মত হতে নেওয়া :- " হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মজতবা (সাঃ) (আঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এলমে তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরজ ? উত্তরে তিঁনি বলেছিলেন, হ্যাঁ- এলমে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ"। যেহেতু আল্লাহ্তাআলা বলেছেন :- "ইত্তা কুল্লাহা হাক্কা তুক্বাতিহি" (আল-ইমরান, আয়াত : ১০২)। অর্থ "তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার মত ভয় কর। যার বাস্তবিক এবং পারিভাষিক নাম হলো তাসাউফ। "ফাত্তাকুল্লাহা মাস্তা তা-তুম"। কালামপাকে আয়াতটি নাজিল হওয়া অনেকেই ইহাকে নাকচ করেছেন। কিন্তু এই আয়াতের অর্থ এবং কার্যকারিতা দ্বারা পূর্বের আয়াত রহিত হবার কোন আলামত মিলে না। তাসাউফ হলো দ্বীনি এলমের একটি অধ্যায়। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষ মমিনে রূপান্তর হয় এবং দেহ -

কাঠামোর ভিতরে কলবকে পরিশুদ্ধ'র মাধ্যমে আত্ম জাগরণ দ্বারা দর্শনবাদ সম্পর্কে পূর্ণতা লাভ করে।

সুফিমতের মাশায়েখগণ তাসাউফ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যে স্থানে তাসাউফের পাঠদান হয় তাহাকে খানকা শরীফ বা দরবার শরীফ বলা হয়। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর পরবর্তী সময়ে সুফি মাশায়েখগণ দেশে দেশে দ্বীনি এলম শিক্ষা তথা ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই তাসাউফ শিক্ষার মিশন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিজরত করেছেন। যেমন :- আমার সোনার বাংলায় বাবা শাহ জালাল (আঃ), বাবা শাহ পরান (আঃ) সহ ৩৬০ আওলিয়ার পূণ্য ভূমিতে রূপান্তর হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাবা খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী আজমেরী (আঃ) ভারতবর্ষে দ্বীন ইসলামকে জাগরণ দেখিয়েছেন। এমন হাজারো তাসাউফধারী ওলি-মাশায়েখগণের সন্ধান পাওয়া যায় - যারা মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন কুলষিত আত্মা গুলোকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১০৪ দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড যা দ্বারা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে সজাগ করে দেয়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা কিংবা জ্ঞান দ্বারা কোরআনুল মাজিদের সকল হুকুম, আহকাম, আদেশ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বুঝা সম্ভব নয়। এজন্য তাসাউফ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যার কারণ হিসাবে বলব, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) এই শিক্ষাকে ফরজ বলেছেন। তাসাউফ জগতে সকল শিক্ষাকে পূর্ণতা দানে সক্ষম। তাসাউফ মানুষের অন্তরে এক ধরনের নূরের প্রবাহ তৈরী করে দ্বীনি শিক্ষার জ্ঞান মানুষের ঈমানি শক্তিকে মজবুত করে তোলে এবং পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করায়।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদে সূরা যুমার ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন :- "হে নবী আপনি বলুন যারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানী নয় তারা কি সমান"। এ প্রসঙ্গে সূরা আলাকের ১-৫ আয়াত পর্যন্ত (আরবি অনুবাদ) (১) ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্‌বিকাল্‌লাযী খালাক। (২) খাল্‌াকাল্ ইন্‌সানা মিন্ আলাক্। (৩) ইক্‌রা ওয়া রাব্বুকাল্ আকরাম্। (৪) আল্‌লাজী আল্‌লাম্ বিল্ কালাম্। (৫) আল্‌লামা ইন্‌সানা মা-লাম্ ইয়ালাম্।

বাংলা অর্থঃ- (১) পাঠ করুণ আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুণ আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে - যা সে জানত না।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে :- "রসূল (সাঃ) (আঃ) এরশাদ করেছেন, দ্বীনি এলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানদের (নর-নারীর) উপর ফরজ"। (বায়হাকী, মিশকাত পৃঃ নং ৩৪)। সূরা যুমার ৯ নং আয়াতে কারিমায় উল্লেখ জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী সমান নয়। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কলম দ্বারা , সৃষ্টি সম্পর্কে বেশির ভাগ তাফসীর কারকগণ জমাট রক্ত উল্লেখ করেছেন, তাই জমাট রক্তই উল্লেখ রাখলাম। কিন্তু মরিচ বুকাইলি আলাক শব্দের অর্থ করেছে যে ইহা এমন কিছু যা দৃঢ় ভাবে আটকানো। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ এসে গেল।

সুফিবাদের বিন্যাসকৃত ব্যবস্থার আলোকে জ্ঞান দুই প্রকার। (ক) বস্তুবাদের সকল বিষয় সুন্দরের দৃষ্টিতে গ্রন্থ অধ্যায়ন পূর্বক অর্জিত জ্ঞানকে জাগতিক জ্ঞান বলে। (খ) আর ভাববাদী বিষয়ের মধ্যে নিহিত হয়ে যোহদ অর্জিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দর্শন ভিত্তিক যে জ্ঞান তাকে এলমে লাদুনি বলে। যা অবশ্যই একজন মোর্শেদ তত্ত্বাবধানকৃত ব্যবস্থায় থাকতে হবে। আবার প্রশ্ন আসে যোহদ কি ? অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয়কে দূরে রেখে মহান স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্যের পূর্ণতার প্রতিফলন এবং বাস্তবায়নকে যোহদ বলে।

তাহলে লাদুনি প্রাপ্ত জ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান সমান হতে পারে না, ইহার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্পাক সূরা কাহাফের বর্ণনায় মুসা (আঃ) এবং আবাদান (আঃ)-এর ঘটনা প্রবাহ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ রাখলাম। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ মহান আল্লাহ্পাক উল্লেখ করলেন যে, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী উভয় কি সমান - ইহা কখনই সমান হতে পারে না। সূরা আলাক উল্লেখ রাখলাম এজন্য যে, হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন সময়কাল জাবালে নূর পর্বত নামক জায়গায় বা হেরা পর্বতের গুহায় মোরাকাবা-মোশাহেদাতে লিপ্ত ছিলেন। এখানেই হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর কাছে জিব্রাঈল আমিন সর্ব প্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫ (পাঁচ) আয়াত নিয়ে হাজির হন। ইহা কোরআনুল মাজিদের প্রথম অহি নামে পরিচিত।

এছাড়া নবুয়্যত প্রাপ্তির সনদ ঐ জাবালে নূর বা হেরা পর্বতের গুহাতে হয়। জিব্রাঈল নামক ফেরেস্তার দেখাও প্রথম এই হেরা পর্বতের গুহাতে হয়। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এলমে লাদুনির জ্ঞান হাসিলের প্রক্রিয়া বা দৃষ্টান্ত হিসাবে মত প্রকাশ করি। হাদিস শরীফে আসছে, "দ্বীনি এলম" দ্বীন অর্থ ধর্ম আর এলম অর্থ জ্ঞান" তাহলে ধর্মের জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া আমরা কোরআন, হাদিস সহ ধর্মীয় বিভিন্ন (ফিকাশাস্ত্র) প্রকার গ্রন্থ অধ্যায়ন পূর্বক অর্জিত জ্ঞানী হই। আবার গুরু-মোর্শেদের নিকটগামী হয়ে তাঁদের দেওয়া মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দর্শন ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করে থাকি। অর্থাৎ এই জ্ঞানকে এলমে লাদুনি বলে, ইহা সিনাবো সিনার জ্ঞান বলেও প্রচলিত, যা মুসলিম ইতিহাসের তাসাউফ এবং আহলে সুফফা সম্পর্কিত অধ্যায় গুলো অধ্যায়নের মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য ফকিহগণ বলে থাকেন, ইসলামের শিক্ষার তিনটি দিক রয়েছে। ১) আকাইদ (বিশ্বাস সমূহ), ২) এবাদত বন্দেগী - উপাসনা, ৩) মু'আমালাত (সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য)। আমরা এই আকাইদ বা বিশ্বাসকেই মূল খুঁটি হিসাবে জেনে থাকি। ইহা দর্শনবাদ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতার মানদন্ড কোথায় যেন কমতি রয়ে যায়। যেমন অনেক ফকিহগণ বলে থাকেন কোরআন এবং সুন্নাহ'র আলোকে জীবন গড়ার কথা।

মূল বিষয় হলো এই অতি চঞ্চল মতি মন প্রতি মুহুর্তে হাজার রকম ভাবনার জাগরণ ঘটায়। ইহা থেকে উত্তরণের যে ব্যবস্থা, উহাই একজন প্রতিনিধির দ্বারা সফল হবার প্রক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে আয়ত্বে নিতে হয়। এটাই গুরুবাদ ব্যবস্থার মূলকথা। একজন দার্শনিক বলেছেন :- Faith is meaningless without any actual practies. অর্থ :- প্রকৃত অনুশীলন ছাড়া বিশ্বাস অর্থহীন। এখানে মূল যে বিষয়গুলো, তা হলো নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) যে দুইটি আমল নীতি দেখালেন, এটা থেকে আমরা পিছু পা বা গাফেল হবার কারণে পূর্ণতার প্রতিফলন হয় না।

(ক) আল-আমিন (সত্যবাদিতা)
(খ) মোরাকাবা-মোশাহেদা হেরা পর্বতের গুহায় ১৫ বছর এর অধিক সময়

এই দুই আমল নীতিকে তাসাউফের খুঁটি হিসাবে বিবেচিত করি।

উল্লেখিত বিষয়ে উপস্থাপন করতে চাই যে, ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা অর্জন এবং তা সনদ আকারে গৃহিত হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। এখানে প্রচলিত ধারায় আমরা দেখতে পাই কোরআন এবং হাদিস অধ্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানীগণ ধর্মের আলেম হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করে থাকেন কিন্তু মূল খুঁটি ঈমান, ইহা তো দেখা যায় না, ইহা পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। তাই যুগে-যুগে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ কর্তৃক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে এবং ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্মীয় দর্শনের পূর্ণতা লাভ করে দেখিয়েছেন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) এরশাদ করেছেন :- "অবশ্যই আমাকে চারিত্রিক উৎকর্ষের পূর্ণতা বিধানের জন্য (নবী হিসাবে) অভিষিক্ত করা হয়েছে"। এতদঃ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, তাসাউফ হলো নৈতিকতার মূলমর্ম বা নির্যাস। তাই তাসাউফের আলোকে জীবন গড়ার যে নির্দেশনামা বা কার্য, উহাই মূলধারার চিরস্থায়ীত্ত্বের প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক (কোরআনুল মাজিদের সূরা আল-আলা, আয়াত : ১৪) বলেন :- "সেই ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে"।

এখন জাগতিক ভাবে আপনি এক লোটা পানি দ্বারা পরিশুদ্ধ (জাগতিক) আর দেহ-মন, জ্ঞান পরিশুদ্ধতা অর্জন (আধ্যাত্মিক) কোনটা সঠিক ? পাঠক বাবা-মায়েদের বিবেচনার উপর প্রতিয়মান করলাম। মহান আল্লাহ্‌পাক যাহাকে যে পরিমাণ বুঝবার ক্ষমতা দান করেছেন, তিনি ততটুকু পরিমাণ বুঝতে সচেষ্ট হবেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনের সূরা আশ শামস-এর ৭, ৮, ৯ ও ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "ওয়া নাফ্‌সিওঁ ওয়া মা সাওয়্যা-হা। ফাআল্‌হামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়া-হা। ক্বদ্‌-আফ্‌লাহা মান্‌ ঝাক্কা-হা। ওয়াক্বদ্‌ খা-বান্‌ মান্‌ দাস্‌সাহা"। অর্থ :- "শপথ সেই নফ্‌সের (ব্যক্তি সত্তার) যাকে তিঁনি যথাযথ করেছেন। অতঃপর তাকে তার পাপ ও তাকওয়ার জ্ঞান প্রদান করেছেন। সেই ব্যক্তিই সফলকাম যে নিজের সত্ত্বাকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সেই ব্যর্থ যে নিজেকে কলুষিত করেছে"। এ কারণে হৃদয় এবং আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জনই একজন তাসাউফধারীর (সুফির) মূল লক্ষ্য থাকে, যা সর্বপ্রথম তাকে অর্জন করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে একটু বলতে চাই যে, বান্দার হক নষ্ট করা হতে বিরত থাকতে মহান আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে ২৭৪ বার-এর মত আয়াতে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইহা থেকে আমরা দূরে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত বা ইহার কার্যকারিতা পূর্ণতা অর্জনে নিরুৎসাহিত বটে।

আরও একটু উল্লেখ করতে চাই যে, তাহলো :- "এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দিলে ৮০ হুকবা জাহান্নাম ভোগ করতে হবে" (হাদিস)। অথচ কোরআনে বর্ণনা এসছে "এতিম হতে মুখ ফিরায়ে নিলে ধর্ম হতে বাদ"। উল্লেখিত শাস্তির পরেও তো ধর্মে নিহিত রয়েছে, অথচ ধর্ম থেকে বাদ এ প্রসঙ্গ থেকে বিরত থাকা হয়ে উঠে না। লোভ -মোহের করাল গ্রাস এমনই বিপর্যয় গ্রস্থ করে তুলেছে আমাদেরকে। ইহা থেকে উত্তরণ পেতে হলে সর্ব প্রথম তাসাউফের (সুফির) আকিদাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সূরা বাকারা ২০৭ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে:- "ওয়া মিনান্ নাসি মাই ইয়াশ্‌রি নাফ্‌সাহুব্ ইব্‌তেগা মার্‌দাতি আল্লাহি - ওয়া আল্লাহু রাউফুম্ বিল্‌ইবাদি"। অর্থ "এবং মানুষের মধ্য হইতে যে বিলাইয়া দেয় তাহার নফ্‌সকে (প্রাণকে) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে। এবং আল্লাহ্ বান্দার সহিত মেহেরবান (প্রেমবিগলিত)"। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাকের নিকট স্বীয় মন প্রাণ উৎসর্গ করাই হলো তাঁর সন্তুষ্টির একমাত্র পথ এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃতি পাওয়া ইহাই তাসাউফ বা সুফিদের মূল বৈশিষ্ট। শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর "হামায়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর সাহাবিগণ ও তাঁদের পরবর্তীদের (তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন) মধ্যকার যাহেদ ও আবেদগণের মধ্য হতেই সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে তারা সকলেই ছিল আবদ। বস্তুতঃ এলমে তাসাউফ পৃথিবীর আদিতম মৌলিক স্বর্গীয় জ্ঞান অর্জনের ধারা, যা মহান আল্লাহ্‌পাক প্রথম মানব বাবা আদম (আঃ)-কে নিজে শিক্ষা দিয়েছেন।

পবিত্র কালামপাকে সূরা বাকারা'র ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "এবং আদমকে নাম সমূহ শিক্ষা দিলেন ইহার সবকিছু তারপর ফেরেস্তাদের উপর উপস্থাপন করিলেন, সুতরাং বলিলেন আমাকে জানাও এসবের নাম সমূহ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এই জ্ঞানের বলে বাবা আদম (আঃ) ফেরেস্তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন প্রমাণিত হলেন এবং আল্লাহ্‌র যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। মহান আল্লাহ্‌তাআলা নিজে যে পদ্ধতিতে বাবা আদম (আঃ)-কে জ্ঞান দান করেছিলেন, তাহাই তাসাউফ। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নবী-রসূলগণ বিশ্ববাসীকে মূল আকিদা বুঝিয়েছেন যা তাসাউফ।

চলমান দুনিয়া এ প্রসঙ্গে এক দিকে ইসলামের ইতিহাসের গোটা অধ্যায়ে মুসলমানদের অন্যতম শক্তির উৎস হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। অন্য দিকে তা স্বতন্ত্র মাজহাব বা ফেরকায় পরিণত হয় নি বরং একনিষ্ঠ আল্লাহ্ প্রেমের চেতনা সকল মাজহাব ও ফেরকায় স্বীকৃত আর এটিই হচ্ছে তাসাউফ বা সুফিবাদ। এটা অনস্বীকার্য যে বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকায় বিভক্ত মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে তাদেরকে ইসলামী সহনশীলতার প্রকৃত চেতনাকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে। অর্থাৎ অভিন্ন ও তর্কাতীত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং মত পার্থক্যের বিষয়গুলোতে পরস্পরের সহনশীল হতে হবে। বস্তুতঃ উল্লেখ হলো তাসাউফ অর্জনকারীকেই মূলত সুফি হিসাবে তুলে ধরা হয়।

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রিয় নবীর (সাঃ) (আঃ) আরব দেশে আবির্ভাব হয়েছিল। আরবের লোকজন তখন জাহেলিয়াতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারা অবস্থান করছিল। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) তাসাউফ শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে বর্বর আরব বাসীদেরকে একটি আদর্শ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এই তাসাউফ শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে এক কথায় সকল মন্দের মূর্ছনাকে পরিহার করে শান্তির রোল মডেল হিসাবে উপস্থাপিত হয়ে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তাসাউফের শিক্ষা বর্জন পূর্বক ধর্মের বিভিন্ন দল-উপদলে নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ আর দ্বন্দ ফ্যাসাদের মহোৎসবে শান্তির ধর্ম অশান্তির মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে নিজেদের মধ্যেই ফ্যাতনা-ফ্যাসাদ বেশি পরিলক্ষিত হয়। মূল কারণ হলো তাসাউফের শিক্ষা না থাকা বা তাসাউফকে নিরুৎসাহিত করাই মূল কার্য বা অধঃপতনের মূল কারণ বলে বিবেচিত হয়। প্রচলিত (জাগতিক) যে সকল ধর্মের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো রয়েছে, তাতে এ বিষয়ে যা শিক্ষা প্রদান করা হয় - বাস্তবিক মূলতঃ মূল বিষয় থেকে আরও নিরুৎসাহিত হয় বটে। যেমন মহানবী (সাঃ) (আঃ) হেরা পর্বতের গুহায় যে শিক্ষা উম্মতদেরকে দেখালেন এ বিষয়ে কেহ যেতে চায় না। এ কারণে এমন মত প্রকাশে বাধ্য হলাম। এখানে আরও একটু উল্লেখ রাখতে চাই যে, ধর্মের বিজ্ঞ শিক্ষকগণ হর-হামেশাই বলে থাকেন যে, ইসলামে বৈরাগ্য ব্যবস্থা নেই, ইহাকে হারাম বলতেও বিবেকে বাঁধা হয় না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ বৈরাগ্য ব্যবস্থা বহন করে চলেছে।

বিষয়টি শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহম্মদ চিশতী (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে :- "ইসলামে রোহবানিয়াত নাই, হাদিসের এ কথাটি ভুল অর্থ করা হইয়া থাকে, যথা ইসলামে বৈরাগ্য নাই অথচ ইসলাম হইল বৈরাগ্য ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। লিখিত কোরআনের প্রতিটি পাতা পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব বহন করিতেছে। গৃহ ছাড়িলেই বৈরাগ্য হয় না, আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত বৈরাগ্য। পবিত্র কালামপাকের সূরা হাশর-এর ৯ নাম্বার আয়াতের শেষের অংশে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "ওমাই ইউকা সুহহান নাফসিহি ফা-উলাইকা হুমুল মুফলেহুন"। অর্থ:- "এবং যে ব্যক্তি তাহার নফ্‌সকে লোভ মুক্ত করিয়াছে, সেই কল্যাণ লাভ করিয়াছে"। পূর্ণ বৈরাগ্য ইসলামের ব্যবস্থা।

আমার মোর্শেদ বলেন, "নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ। ইহাই তাসাউফ শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ, ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে চাই, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যে সকল মাজহাব এবং ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে সকলকে এক কাতারে সামিল করতে বা সকলের নিকট গ্রহণ যোগ্য মাধ্যম সুফিবাদ বা তাসাউফ শিক্ষার মাধ্যমে একত্রীকরণ করা সম্ভব বলে মনে করি। কারণ ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। একনিষ্ঠ আল্লাহ্‌র প্রেমের যে চেতনা তা জাগরিত হলেই কেবল তা সম্ভবপর হয়ে উঠবে, ইহাই তাসাউফ বা সুফিবাদের শিক্ষা।

বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকায় বিভক্ত মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে তাদেরকে ইসলামী সহনশীলতার প্রকৃত চেতনাকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে। অর্থাৎ অভিন্ন ও তর্কাতীত বিষয় পরিহার পূর্বক মূলের ধারা আপন দেহ কাঠামোতে বিকশিত হবার ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা আয়ত্তের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষ বা মোমিনে রূপান্তর হতে পারবে। সেই শিক্ষাগুলো তাসাউফ বা সুফিবাদের আলোকে প্রচলন। এখানে ভারত উপমহাদেশে ৯২ লক্ষ লোকের হেদায়েত গ্রহণ ৪ কোটি মানুষের মধ্যে, বাংলাদেশে ৩৬০ আওলিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের বিকাশ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ইসলামের পূর্ণ জাগরণ ঘটিয়েছিল, তা সুফি সাধকদের শিক্ষা, নীতি, নৈতিকতা, আদর্শের (প্রেম বিগলিত) ব্যবস্থাই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আছে। এই আলোকে আমাদের মুসলমানিত্ব সুন্দর অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বস্তুতঃ সুফিবাদের সংস্কৃতি হচ্ছে এক সমন্বিত ইসলামী সংস্কৃতি। তাই পরস্পর দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকার অনুসারী মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার সম্ভবনা সুফিবাদে রয়েছে। মাজহাবী ও ফেরকাগত সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করে ও আরেফ সূলভ মনোভাব গ্রহণের মাধ্যমেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মত প্রকাশ করি। মহান আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর যে আরেফ তিঁনি সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। আরেফ কবি বলেছেন :- "একজন আরেফ ইসলামে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, আবার কুফরেও ধ্বংস প্রাপ্ত হন। প্রজাপ্রতির কাছে মসজিদ ও গীর্জার বাতির কোন পার্থক্য নেই।

বস্তুতঃ সুফিবাদ একটি রাজনীতি বর্জনকারী ব্যবস্থা, যা নিজের আত্মশুদ্ধি প্রক্রিয়াকে একটি পূর্ণতার অবগাহনে পরিচালনার তাগিদ দিয়ে থাকে। এই পরিপূর্ণতার মানদন্ড গৃহিত বা সম্পন্ন হলেই কেবল অন্যকে শিক্ষা দানের এজাজত প্রাপ্ত হয়। এমন ভাবধারার প্রেক্ষাপটে একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় একত্রীভূতন করবার চেষ্টায় দেখা গেছে সুফিদের দ্বারা বিপ্লব বা বিদ্রোহ সাধিত হয়েছে জুলুম এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে। যে কারণে বলা যায় যে, কোন প্রকার অন্যায়কে সমর্থন না দেওয়ার কারণে এই সমস্ত বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। ইহাতে অনেক সুফি এবং তাঁর সমর্থকগণ জীবন দিয়ে যা ধর্মীয় ইতিহাস কালের সাক্ষ্য হিসাবে বহন করে চলছে। কারণ হলো :- "ওয়াহেদাল অজুদ" অর্থ অস্তিত্বের একত্ত্ববাদ অর্জনকারী একজন আরেফ বা সুফি যখন বিশৃঙ্খল একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে একত্রভূতন করতে শুরু করে, তখনই সমসাময়িক নেতা বা প্রধানদের কর্তৃত্ব নিয়েই মূলতঃ এই সংঘাত বা বিড়ম্বনা আজও চলমান বলে প্রতিয়মান হয়ে চলেছে। ওয়াহেদাল অযুদ মূলত "আরবাবুত তাওহীদ" অর্থ তাওহীদের অধিকারী রূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এমন পর্যায়ের আরেফ বা সুফিগণের সমসাময়িক ভোগ-মোহ দ্বারা পরিচালিত সমাজ সংসার থেকে মানব-মানবীকে উত্তরণ সত্যিই একটি দুরূহ ব্যবস্থাপত্র। ইসলাম বা একত্ত্ববাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "সেই সত্ত্বা" বইটি পড়বার জন্য পাঠক বাবা-মায়েদেরকে অনুরোধ রাখলাম।

সুফিবাদের সূচনা সম্পর্কে অনেক সুফি এবং ইমামগণ মত প্রকাশ করে থাকেন। মওলা আলী (আঃ) থেকে এই শিক্ষার শুরু যা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) জীবদ্দশায় তাঁর স্থলাভিসিক্ত করে গেছেন। যা "গাদিরে খুম" এর কার্যক্রম এবং কোরআনের সর্বশেষ দুইটি আয়াত নাজিলকৃত ব্যবস্থার কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া উল্লেখ। যে কারণে মওলা আলী (আঃ)-কে সুফিবাদের নেতা বা ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ রাখতে চাই যে, শিয়াদের অন্যতম প্রধান হলেন মওলা আলী (আঃ)। শিয়াগণ পবিত্র কালাম শাস্ত্র থেকে শুরু করে দর্শনের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিক সুফিবাদে উপনীত। এমন কি হিজরী চতুর্থ বর্ষ হতে শিয়াদের মধ্যে তাসাউফ বা সুফি চর্চার প্রচলন ছিল। এ বিষয়ে মহানুভবতা, ঐতিহ্যের এবং সমবেদনা মূলক সম্মানের উল্লেখ দেখা যায়। সুফিবাদ বিষয়কে স্বাদরে ও সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। এ সকল বিষয়গুলো বিচারিক বিশ্লেষণ করলে সকল মাজহাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব, যা কেবল সুফি আকিদাতে দৃষ্ট। কারণ তাঁরা কোরআনুল মাজিদের গূঢ় তাৎপর্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং মানুষকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করাইতে দেহ কেন্দ্রিক ব্যবস্থার উন্নতি ও হকের উপর পরিচালিত হবার শিক্ষাই মূল কাঠামো হিসাবে বিবেচিত।

সুফিগণের আকিদা হলো কোন কুতুব ব্যতীত বিশ্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়। মানুষের ঈমান ও হেদায়েতের হেফাজত নির্ধারিত কুতুবের উপর নির্ভরশীল (একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল)। তিঁনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অধিকারী ও ঈমানের হেফাজতের অধিকারী সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এলহামের মাধ্যমে নির্দেশ লাভ করে থাকেন। এতদ প্রসঙ্গে :- কুমাঈল ইবনে জিয়াদ ছিলেন মওলা (আঃ)-এর শিষ্য এবং প্রথম যুগের সুফিদের অন্যতম একজন। তাসাউফের অনেক সিলসিলা তাঁর মাধ্যমে মওলা আলী (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। মওলা আলী (আঃ) কুমাঈলকে সম্মোধন করে বলেন :- "এ ধরণী কখনও অকাট্য প্রমাণ (হুজ্জাত) সহ আল্লাহ্‌র জন্য দন্ডায়মান ব্যক্তি থেকে শূন্য হবে না, এরূপ ব্যক্তি হয় প্রকাশ্য ও বিখ্যাত হবে অথবা ভীত শঙ্কিত ও আত্ম গোপনকারী হবে। যাতে আল্লাহ্‌র হুজ্জাত সমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ (বাইয়্যেনাত) বাতিল হবে না। তাঁরা সংখ্যায় কত জন এবং কোথায় ? আল্লাহ্‌র শপথ তাঁদের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌র স্বীয় হুজ্জাত ও বায়্যেনাতসহ -

তাঁদেরকে রক্ষা করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের অনুরূপ লোকদের হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাদের মত লোকদের অন্তরে এর বীজ বপন করেন। অন্তঃদৃষ্টিজাত প্রকৃত সত্য (হাকিকত) ভিত্তিক জ্ঞান তাঁদের মধ্যে স্মৃতি লাভ করে এবং তাঁরা প্রত্যয়ী চেতনার অধিকারী হন। বিলাসী আরাম প্রিয়দের নিকট যা কিছু কঠিন প্রতিভাত হয়, তাঁদের নিকট তা সহজ অনুমেয় হয়। আর অজ্ঞ লোকেরা যা কিছু ভয় পায়, তাঁদের নিকট তা প্রিয় হয়ে যায়। তাঁদের দেহ পার্থিব জগতে থাকে কিন্তু তাঁদের আত্মা সমুন্নত লোকে (স্রষ্টার সান্নিধ্যে) অবস্থান করে। তাঁরা আল্লাহ্‌র ধরণীর বুকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রতিনিধি এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে তাঁরই দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী। আহা! আহা! তাঁদেরকে দেখতে আমার কতই না ইচ্ছা হয়! হে কুমাঈল, আমি যা বলতে চেয়েছি তা বলেছি। এবার তুমি যখন ইচ্ছা যেতে পার”।

মওলা আলী (আঃ) সুফিদের যে পরিচয়টুকু তুলে ধরেছেন, এর চেয়ে উত্তম সুফির পরিচয় বা প্রকাশ আমার জানা নাই। প্রাচ্যবিদরা সাধারণত সুফি ধারার উৎপত্তি ও বিকাশে আহলে বায়াতের ইমামগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এড়িয়ে গেছেন বা না জানার ভান করেছেন। কিন্তু সুফিবাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক অনুধাবন করতে হলে সুফিদের লিখনী কিতাব ও সুফিতত্ত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যে সকল পাগল, কুতুব, আবদাল, আরিফ রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে জানা অপরিহার্য বটে। এজন্য বলব সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানব জাতির তার প্রভুর পরিচয় জানা এবং প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, আর এর মধ্যেই মানব জাতির চির শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনুল মাজিদের সূরা বাকারা'র ২০৭ নাম্বার আয়াতে বলেন :- “ওয়া মিনান্ নাসি মাই ইয়াশ্‌রি নাফ্‌সাহুব্ ইব্‌তেগা মার্‌দাতি আল্লাহি - ওয়া আল্লাহু রাউফুম্ বিল্‌ইবাদি”। অর্থ “এবং মানুষের মধ্য হইতে যে বিলাইয়া দেয় তাহার নফ্‌সকে (প্রাণকে) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে। এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সহিত মেহেরবান (প্রেমবিগলিত)। উল্লেখিত আয়াতে কারিমায়, নফ্‌স তথা প্রাণকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দেওয়ার কথাটি বলা হয়েছে। যেহেতু -

নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান অবস্থান করে, সেহেতু মানুষের নফ্‌সটিকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী এবং ভালমন্দ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মানুষের এই নফ্‌স হতে মন্দ অর্থাৎ খান্নাসকে আপন নফ্‌স হতে মুক্ত করবার আহ্বান কোরআন বারবার বিভিন্ন ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়েছে। এই খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এবাদত লাভে পূর্ণতা। তাই সর্ব প্রথম অগ্রে থাকে হলো নিয়ত, আর এই নিয়ত বাস্তবায়ন করতে একজন গাইড বা শিক্ষক প্রয়োজন, যিনি এ বিষয়ে সফলতা লাভ করেছেন। কোরআনে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন :- "এরূপ মানুষের নিকট আল্লাহ্ মেহেরবান বা প্রেম বিগলিত। এই উদ্দেশ্য সফল করতে যিনি মোরাকাবা-মোশাহেদাতে লিপ্ত আছেন, এমন নফ্‌সই এ বিষয় বুঝতে সচেষ্ট হবে। যদিও ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা, সমাজ কেন্দ্রিক ব্যবস্থা নয়। যখন অধিকাংশ মানুষ প্রাণটিকে (নফ্‌স) বিলাইয়া দেয়, তখনই সমাজ জীবনে সত্যিকারের শান্তির ভারসাম্যটি বিরাজিত থাকে।

এ প্রসঙ্গে আয়াতে কারিমার শানে নুযুল সংক্রান্ত সর্ব সম্মত মত হলো :- "রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর হিজরতের রাতে বিছানাতে মওলা আলী (আঃ)-কে শুয়ে রেখে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) যাত্রা করেন। মওলা আলী (আঃ) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুয়ে আছেন, যেন কাফেরেরা মনে করে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) শুয়ে আছেন। কাফেররা তাঁর বের হবার অপেক্ষায় থাকে। সেই অবকাশে তিঁনি সহজে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারেন এবং কার্যত তাই হয়েছিল। মওলা আলী (আঃ) এভাবে প্রাণের ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়। এজন্য সকল তরিকার মূল উৎস বা সিলসিলার সূচনাস্থল মওলা আলী (আঃ)-কে গণ্য করা হয়। তবে নক্‌সা বন্দিয়া তরিকা তাঁকে সূচনাস্থল মনে করে না বলে মত প্রকাশ করেন। প্রথম তিন খলিফার পর চতুর্থ খলিফা হিসাবে মত প্রকাশ করেন। মওলা আলী (আঃ)-কে সাইয়্যেদুল আওলিয়া (ওলি বা সুফিদের) নেতা বলা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট স্বীয় মনপ্রাণ সমর্পণ করাই তাঁর (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টির একমাত্র পথ। তেমনি আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিনিধি হবারও উপায় এমন। ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকারে ঘটনা হলো কারবালার প্রান্তরে বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর শাহাদত বরণ, এটাকে শাহাদতে কারবালা বলা হয়।

অনেক আলেমে দ্বীনের মতে সূরা ফজরের ২৭ হইতে ৩০ নাম্বার আয়াতের শানে নুযুল বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর শাহাদতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। এ বিষয়ে স্মরণতব্য যে, মওলা আলী (আঃ) ও বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ)-এর ঘটনা (শাহাদতের) ইসলামের ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়, সেই সাথে গোটা মানব জাতির জন্য ব্যক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহনসহ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, মওলা আলী (আঃ) ও বাবা ইমাম হুসায়েন (আঃ) অতি উঁচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী।

তাই তাসাউফ ইসলামের সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা যা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠতা এবং সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ সাধিত করবার পন্থা। এই আলোকে জীবন গড়তে পারলে ধর্মের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব হবে। তাই ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটি স্বতন্ত্র পথও বটে। তাই এই পথে নিজেকে নিয়োজিত করে আল্লাহ্‌র প্রেম বিগলিত ব্যবস্থার পর্দা উন্মোচন পূর্বক সকল ধোঁয়া-কুশায়া দূরে সরিয়ে মানবকূলকে সৃষ্টির যথার্থতা সম্পর্কে পূর্ণতা লাভে সচেষ্ট করে। এজন্য সুফিদের নির্ধারিত কোন মাজহাব দেখা যায় না। শিয়া, সুন্নি, আশারিয়া, জাবারিয়া, মোতাজিলা দ্রুরুজ সহ বিভিন্ন মাজহাবের মধ্য থেকে তাসাউফের আলোকে সুফি সাধকদের নাম স্বরণীয় হয়ে আছে। তাই উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবার আহ্বান রইল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের মতে তাসাউফের সংজ্ঞা।

ইমাম গাজ্জালী (আঃ) বলেন :- “তাসাউফ এমন এক বিদ্যা যা মানুষকে পাশবিকতা থেকে উন্নত করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়”।

বিশ্ব বিখ্যাত সুফি সাধক বাবা যুননুন মিসরী (আঃ) বলেন :- “আল্লাহ্‌তাআলা ছাড়া সবকিছু বর্জন করাই হলো তাসাউফ”।

বাবা জুনায়েদ বোগদাদী (আঃ) বলেন :- “আল্লাহ্‌র এবাদতে পরিপূর্ণ ভাবে নিয়োজিত হওয়া এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট স্বানন্দে গ্রহণ করার নাম তাসাউফ”।

মোট কথা অন্তরের বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, হিংসা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হলে মহান আল্লাহ্‌র পরিচয়, প্রেম ও নৈকট্য লাভ করবার সাধনাকেই তাসাউফ বা সুফিবাদ বলে।

হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) হেরা গুহায় ১৫ বছরের অধিক সময় মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যম দিয়ে তাসাউফের পূর্ণতা দেখালেন এবং একটি বর্বর জাতিকে আদর্শ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথন করেছিলেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার পরেও অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ) পশু-পাখির ভাষা বুঝতেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত সুলাইমান (আঃ) আকাশ পথে উঁড়ে বেড়াতেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত মুসা (আঃ) লাঠির আঘাতে নীল নদের পানিতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন। তাসাউফের জ্ঞান দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করেছিলেন। এমন হাজারো দিক দর্শনমূলক ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তাসাউফের। তাসাউফের ওলিদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, যেমন :- গাউসে খোদা গাউসে পাক বড় পীর আব্দুর কাদের জীলানী (আঃ) বার বছর পূর্বে নৌকা ডুবে যাওয়া বরযাত্রী সহ সকলকে জীবিত উদ্ধার করেছিলেন। খাজা গরীবে নেওয়াজ (আঃ) অসংখ্য মোজেজা বা কারামত স্থাপন করেছিলেন।

সারা বিশ্বের জালালী পীর বাবা আলাউদ্দীন কালিয়ার সাবেরী (আঃ), বাবা জুনায়েদ বোগদাদী (আঃ), বাবা শেখ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি (আঃ), বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শেকর (আঃ), বাবা বেদম ওয়ারেছী (আঃ), বাবা শামসেত্তাব্রীজ (আঃ), বাবা মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (আঃ), বাবা মুনসুর হাল্লাজ (আঃ), বাবা নিজামউদ্দীন আউলিয়া (আঃ), বাবা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (আঃ), বাবা আমির খসরু (আঃ), বাবা বায়োজিদ বোস্তামী (আঃ), বাবা শাহ জালাল (আঃ), বাবা শাহ পরান (আঃ), বাবা মোজাদ্দেদে আল-ফেসানী (আঃ), বাবা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী (আঃ), শাহ্‌ আহম্মদ উল্লাহ্‌ (ওরফে) জান শরীফ শাহ্‌ সুরেশ্বরী (আঃ) সহ অসংখ্য ওলিদের শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত তাসাউফের আলোকে পরিচালিত।

কাজেই একজন প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন পবিত্র অন্তঃকরণ এবং আদর্শ চরিত্র। আর এই দুই ধারার শিক্ষা প্রণালী তাসাউফ দ্বারাই সম্ভব। যদিও গুরুবাদ থেকে সূচনা। এর মূল বিষয় হলো একাগ্রতা অর্জন তাসাউফ ব্যতীত পাওয়া যায় না। যে কারণে এই শিক্ষার দিকে মানুষ আত্মনিয়োগ করতে কমই আগ্রহী হতে দেখা যায়।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহান আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আগত নবী-রসূল, ওলি, পীর, ফকির, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফ, আবাদান সকলকে মহান আল্লাহ্‌পাক যে জ্ঞান দান করেছিলেন, উহাই হলো তাসাউফ। ইহাই হলো বাতেনী জ্ঞান। যার সাহায্যে মানুষ আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করে (স্রষ্টা ও সৃষ্টির) আল্লাহ্‌র ভেদ-রহস্য সম্পর্কিত সকল কিছু অবগত হয়ে স্বার্থক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাতে ভূষিত হয়ে আল্লাহ্‌র খলিফার মর্যাদায় উপণীত হয়। এরই আলোকে জীবন গঠন এবং পরিপূর্ণতা লাভে তৎপর হবার মূল শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করত মানব-মানবী সৃষ্টির যথাযথ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবার শিক্ষা আমাদের মধ্যে বেগবান হবার কথা কিন্তু দূর্ভাগ্য জনক হলেও সত্য এই শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন মানুষ এসকল শিক্ষাকে ভুলতে বসেছে। যদিও কেউ কেউ এ শিক্ষার দিকে যেতে আগ্রহী তারা আনুষ্ঠানিকতার বলয়ে মর্মজুস্ত। এ বিষয়ে মওলা আলী (আঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট সহচর সে, যার জন্য আনুষ্ঠনিকতা পালন করতে হয়"। মহান আল্লাহ্‌পাকের দর্শন ভিত্তিক জ্ঞান লাভ (সাক্ষাত) যা দুনিয়ার কোন বই-পুস্তক দিতে পারে না। মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ এর স্বাক্ষর রেখেছেন। অথচ বর্তমান সমাজ সংসার এমনকি রাষ্ট্রীয় কাঠামো কোন নীতিতে চলমান তার সদুত্তর একনিষ্ঠ মনে ভাবলে জবাবটা নিজের কাছেই মেলে। এ প্রসঙ্গে আরও একটু উল্লেখ রাখতে চাই যে, মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (আঃ) বলেছেন :- "যখন আমি আলেম ছিলাম না, তখন সবাই আমাকে মওলানা বলতো কিন্তু যখন আমি আলেম হলাম তখন সবাই আমাকে পাগল বলতে লাগল"।

পাঠক বাবা-মায়েরা একটু চিন্তা করুন, মহান এই ব্যক্তির উক্তি যার সম্পর্কে দুনিয়ার মনিষীগণ বলেছেন, পৃথিবীর বুকে এমন আলেম আর হয় না, হতে পারে না। এজন্য সুফি সাধকদের আলোকে তাসাউফকে ইসলামী নৈতিকতার নির্যাস বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো :- এলমে তাসাউফকে অ-ইসলামী ব্যবস্থা বলে বিবেচিত করেন। যেখানে হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) হেরা পর্বতের গুহায় ১৫ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করলেন।

হুজুপাক (সাঃ) (আঃ) যে শুধু মুসলমানদের নবী তা কিন্তু নয়, আবার শুধু মানুষের নবী তা-ও কিন্তু নয়। এতদঃ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক কালাম পাকে বর্ণনা করেন :- "আপনাকে গোটা বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে"। জাতী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যাকে মেনে থাকেন তিঁনি আর কেহ নন, রহ্‌মাতুল্লিল আলামিন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) তাঁরই জীবদ্দশায় ১৫ বছর একাকী মোরাকাবা-মোশাহেদা করেন, ইহা আজ ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার বলয় থেকে অপসারণ হবার কারণে ধর্মের এত বিশৃঙ্খল রূপ। এর থেকে উত্তরণ পেতে হলে হেরা পর্বতের ইসলামী যে চেতনা, তা বুকে লালন করে একজন মোর্শেদের নির্দেশিত ব্যবস্থায় মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত থেকে সত্যের উন্মেষ ঘটানোর আহ্বান। কারণ হলো আজ পর্যন্ত তাসাউফধারী কোন সুফি মাজহাব বা বিভিন্নতার কোন দল উপস্থাপন করেন নি। তাঁদের মূল আদর্শ হলো সত্যকে লাভ করা। এর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সাক্ষাত কার্যকর করা। জাতি, ধর্ম-বর্ণ সবাইকে মূল বিষয়ে জাগ্রত আত্মার অধিকারী রূপে তৈরী করাই হলো মূল লক্ষ্য। যাকে আমরা বলে থাকি আত্মার মুক্তি। এই মুক্ততা অর্জনকারীগণ প্রকৃত ধর্মের প্রতিনিধিত্ত্ব করবার যোগ্যতা সম্পন্ন সুফি সাধক তৈরী করে থাকেন। যাদের দ্বারা ধর্মের চালিকা শক্তি পরিচালিত হলে মানুষ ধর্মের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন ও স্বার্থকতা পাবে। তাই হানাহানি, বিতর্কিত মতাদর্শকে থামিয়ে আসুন আমরা সবাই তাসাউফের আলোকে ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা সময় আত্ম নিয়োগের মাধ্যমে নিজেদেরকে জাগ্রত করবার মানসে চেষ্টা চালিয়ে যাই। যে মতে বা মতাদর্শের উপর পরিচালিত হই না কেন, সেটাকে থামিয়ে মূল আদর্শের দিকে কিছুটা সময় কাজে লাগানোর জন্য মতপ্রদান বা আহ্বান। যদিও তাবলীগের চিল্লাহ'র আহ্বান কিন্তু ইহা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় গুরু নির্দেশিত পথ বা মতাদর্শে। পরিশেষে বলতে চাই, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যম দ্বারাই মূলত তাসাউফ শিক্ষার সূচনা। এই শিক্ষার আয়ত্ত করবার প্রথম কাজ হলো নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের দিকে স্থীর হওয়া এবং গুরু নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র যে ভাবে নির্দেশ করে, প্রয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। তকদিরে থাকলে হয়ত দ্বার উন্মোচন হতে পারে দয়াল সহায় হলে। কিছু প্রাপ্ত না হলেও বিষয় সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান লাভে সকল বিতর্কিত অবসান হবে। এ বিষয়ে মতানৈক্য কমে আসবে।

তাই তাসাউফ সম্পর্কিত কিতাব সমূহ অধ্যায়ন পূর্বক ধারণা লাভে সচেষ্ট হবো। কারণ হলো মহান আল্লাহ্পাক প্রতিটি মানুষের মধ্যে রুহ রূপে আছেন। তাঁকে উদ্ভাসনের প্রকৃত যে পথ, সেই পথ ধরে তিল তিল করে তাঁর দর্শন বা সাক্ষাত, মোলাকাত অর্থাৎ এক কথায় তাঁরই দ্বারা নিজেকে পরিচালনা বিষয়ে যে শিক্ষা তা-ই এই তাসাউফ। তাসাউফের মাধ্যমে প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে মনে করি। আর এই পথের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একজন গুরু অবশ্যই প্রয়োজন। গুরু ব্যতীত এই তাসাউফ বিষয়ে মোরাকাবা-মোশাহেদাতে কেউ চেষ্টা না করবার জন্য অনুরোধ রইল। ইহাতে সত্যের উন্মেষ ঘটা তো দূরের কথা, শয়তানের ধোঁকায় পরে নিজের পূর্ণতার বদৌলতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত আর গীবতের মহোৎসব পরিচালনার দ্বাড় উন্মোচন হতে পারে। এ কারণে নিরুৎসাহিত করার কারণ হলো সত্য দ্বারা সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করবার একটি প্রক্রিয়া। এজন্য কালে-কালে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূলগণকে আল্লাহ্পাক পাঠিয়েছেন। হাকিকতে এখনও এ ধারা চলমান বলে জানি। তাই এ ধারার জ্ঞানকে এলমে লাদুনি বলে। ইহাই মহান আল্লাহ্পাকের এক রহস্যময় লীলাখেলা। এই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনসহ তাঁর (আল্লাহ্র) প্রতিনিধিত্ব করবার অনুমোদন দিয়েছেন।

আমরা মানুষ কলমকে নিজের ইচ্ছামত চালিয়ে স্রষ্টার নাম জুড়ে দিতে পিছু পা হই না। মানবিক মূল্যবোধ হারাতে সময় লাগেনা। এ কারণে তিঁনি আলেমূল গায়েব অর্থাৎ পূর্বে জ্ঞাত। এ কারণে হয়ত এই ব্যবস্থা জারী করে রেখেছেন। কারণ আল্লাহ্ বলেন, সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টির শেষে, সৃষ্টির মাঝে এবং সৃষ্টির সবখানে তিঁনি (আল্লাহ্) বিরাজিত। আবার হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) বলেন :- " আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আউছাতুনা মোহাম্মদ, কুল্লানা মোহাম্মদ, আখেরানা মোহাম্মদ"। অর্থ "সৃষ্টির আদিতে আমি মোহাম্মদ, সৃষ্টির মাঝেও আমি মোহাম্মদ, সৃষ্টির সকল জায়গায় আমি মোহাম্মদ এবং সৃষ্টির শেষেও আমি মোহাম্মদ"। অর্থাৎ স্রষ্টার প্রকাশ ও বিকাশ মোহাম্মদ সত্ত্বাতে। স্রষ্টার বিভাজনকৃত মূল কেন্দ্র মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ) হতে, তাই তাঁর দেখানো পথ হলো তাসাউফের মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত করা এবং তাঁর পরবর্তীতে ধর্মকে কায়েম করা বা স্রষ্টা প্রণীত বিধানকে কার্যকর রূপে বাস্তবায়ন করা। ইহাই ধর্মের মূল শিক্ষা। দয়াল সহায় হউন।

আহলে সুফফা বা আসহাবে সুফফা

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)-এর জাবালে নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের ধ্যানমগ্ন বিষয়ের মধ্যেই আহলে সুফফার বীজ নিহিত বা এ ধারার সূচনা করেন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সময়েই একদল সাহাবী আধ্যাত্মিকার গুরুত্ব বুঝতে পেরে মসজিদে নববীর সুফফা পাশে একটি স্থানে সারাক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। অর্থাৎ তাঁরা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর ভালবাসায় দিবা-রাত্রি আত্ম পরিশুদ্ধিতে ব্রতী থাকতেন। মুসলমানদের কেবলা যখন জেরুজালেম বরাবর ছিল, তখন এই সকল সাহাবীদের জন্য রসূল (সাঃ) (আঃ) উক্ত স্থানে আহলে সুফফা প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ মসজিদে নববীর পাশে পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরী করা হয়, তা-ই আহলে সুফফা বা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত।

আহলে সুফফা :- আহলে সুফফা দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আহল শব্দের অর্থ পরিবার, সদস্য ইত্যাদি এবং সুফ শব্দের অর্থ পশমী, পরিশুদ্ধ ইত্যাদি, এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় পশমী জামা পরিহিত সদস্যবৃন্দ বা (আত্ম) পরিশুদ্ধ দলের সদস্যবৃন্দ। পারিভাষিক অর্থে আহলে সুফফা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সেই সকল সাবাহীকে বলা হয়, যারা রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর প্রেমে এতটাই পাগল ছিলেন যে, রসূল (সাঃ) (আঃ)-কে এক নজর দেখবার জন্য মসজিদে আল-নববীর একপাশে দিবা-রাত্রি অপেক্ষা করতেন। তাঁরা ছিলেন তরুন অবিবাহিত ও দরিদ্র। উক্ত সাহাবীরা সাধারণত সহায় সম্বলহীন ছিলেন। যারা ব্যবসা, শিল্প, কৃষি এবং ইসলাম শিখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কোন হস্তকর্মে শিক্ষিত ছিলেন না। তাই তাঁরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)-এর সহচার্যে থেকে, আল্লাহ্‌র স্মরণ, নবীর বাণী শোনা, উপদেশ, কোরআন তিলোয়াত করে দিন কাটিয়ে দিতেন। তাঁরা হুজরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর জীবনাদর্শ বা কার্যবলীগুলো প্রত্যক্ষ করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর আদেশ পেলে তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিভিন্ন অঞ্চলে বেরিয়ে পড়তেন।

সুফফা মূলত মসজিদে নববীর উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল। হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) প্রার্থনা করাতে আল্লাহ্‌র আদেশে কিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন হওয়াতে মদিনা থেকে তা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হয়, এর ফলে সুফফা মসজিদের পিছনে পরে যায়। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে তাহুল মালিক যখন মসজিদটি প্রসারিত করেন, তখন আহলে সুফফার অবস্থান পরিবর্তন হয়। যা এখন বর্তমান দিক্কত আল-আগাওয়াত নামে পরিচিত।

ধর্মীয় আঙ্গিকে তাঁরা পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে বিকশিত করবার সাধনায় থাকতেন। সবাই অর্থনৈতিক টানা-পোড়েনের কারণে থাকতেন তা কিন্তু নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলে সুফফায় থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থেকেছেন। উদাহরণ হিসাবে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল কিন্তু সে দিকে মনোনিবেশ না করে আহলে সুফফার আকিদাতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সাথে থাকতেন। এক কথায় বলা যেতে পারে ঐ যুগে এটাই ছিল ইসলামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে দুই ধরনের ছাত্ররা থাকতেন। সার্বক্ষণিক ছাত্র ও আশ্রয়হীন ছাত্র। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) আবু হুরায়রাকে আসহাবে সুফফার আরিফ বা প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) আহলে বা আসহাবে সুফফাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আহলে সুফফারা আনসারদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) কোন সদগা পেলে পুরোটাই আহলে সুফফাদের জন্য ব্যয় করতেন। এছাড়া কোন উপহার পেলে নিজেদের জন্য কিছু রেখে বাকিটা আহলে সুফফাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিঁনি ধনী সাহাবাদের উৎসাহ দিতেন আহলে সুফফা বাসীদের যেন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানায়। এছাড়াও হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) নিজ গৃহে আহলে সুফফাদের খাবারের জন্য (খাবার থাকলে) নিমন্ত্রণ করে, কখনও দুধ পান করাতেন, কখনও খেজুর ও রুটি ইত্যাদি পরিবেশন করাতেন। আহলে সুফফা বাসীর জন্য হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) এতটাই দরদী ছিলেন, যা ভাষার শৈলীতে বোঝানো দায়।

পবিত্র কোরআনুল মাজিদে সূরা বাকারা'র ২৭৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন :- "লিল্‌ফুকারাই আল্‌লজিনা উহসিরু ফি সাবিলি আল্লাহি লা ইয়াস্‌তাতিউনা দর্‌বান ফি আরদি, ইয়াহ্‌সাবুহুম জাহিলুনা আগ্‌নিয়াআ মিনাত -

তাআফ্ফাফি, তারিফুহুম বিসিমাহুম, লা ইয়াস্আলুনা নাসা ইল্হাফান, ওয়া মা তুন্ফিকু মিন খাইরিন ফাইন্না আল্লাহ্া বিহি আলিমুন"। অর্থ :- "ফকিরদের জন্য–যাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছে আল্লাহ্র পথের মধ্যে তাহারা ক্ষমতা রাখেনা পৃথিবীর মধ্যে আঘাত হানিতে, তাহাদেরকে মনে করে জাহেলেরা (অজ্ঞ, মুর্খ) ধনী (সম্পদশালী) না চাওয়া হইতে, তুমি তাদেরকে চিনিবে তাহাদের চেহারার দ্বারা, তাহারা চায় না মানুষের (নিকটে) কাকুতিমিনুতিসহ, এবং যাহা তোমরা ব্যয় কর ভালো হইতে সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে জানেন"।

উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে আহলে সুফফার মত এক শ্রেণীর লোকদেরকে (ফকির-দরবেশ, ওলি-আওলিয়া ইত্যাদি যাহারা আল্লাহ্র কারিকুলাম নিয়ে আছেন) সাহায্য করবার কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের খেদমতে সার্বক্ষণিক ভাবে উৎসর্গ করে রাখেন, তাঁদেরকে দান ও সহযোগিতার কথা বলা হইয়াছে। কারণ সার্বক্ষণিক দ্বীনি মেহনতি করবার কারণে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করার সুযোগ থাকে না। আহলে সুফফাদের শরীর আবৃত করার মত কোনও পূর্ণ কাপড়ও ছিল না। আর খাবারের বিষয়তো আরও জটিল - কখনও কখনও দু'একটি খেজুর দ্বারা দিন অতিবাহিত করতে হতো। এমন ত্যাগের মহিমায় মূলধারাকে জাগ্রত বা আয়ত্তের মানদন্ড হয়ত সীমিত আকারে হলেও ধর্মীয় ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আমরা জ্ঞানীদের কিছু কিছু মতে উল্লেখ দেখি, তাহলো একটি ক্ষুধার্থ পেট যে শিক্ষা দিতে পারে, দুনিয়ার কোন বই পুস্তক সে শিক্ষা দিতে পারে না।

ফাদ্বালাহ ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত :- "রসুলআল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) যখন লোকদের নামাজ পড়াতেন তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফফা। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, "এরা পাগল"। একদা রসূলআল্লাহ্ (সাঃ) (আঃ) নামাজ সেরে তাঁদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র পছন্দ করতে"। (তিরমিজি : ২৩৬৮, আহমদ : ২৩৪২০)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিঁনি বলেন যে :- "আমি সত্তর জন আহলে সুফফাকে এই অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁদের কারও কাছে গা ঢাকবার জন্য চাঁদর ছিল না, কারও কাছে পরিধানের বস্ত্র ছিল না এবং কারও কাছে চাঁদর (এক সঙ্গে দুইটি বস্ত্রই কারও ছিল না) তাঁরা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারও পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারও পায়ের গাঁট পর্যন্ত হত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়। (বোখারী : ৪৪২)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে একুট বলে রাখি :- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন সুফফায় বসবাসকারী অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট পন্ডিতদের একজন অন্যতম সাহাবা। আবু হুরায়রার পূর্ব নাম আবদে শামস। তিনি দাউস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিড়ালকে খুবই ভালবাসতেন, "আবু হুরায়রা" শব্দের অর্থ হলো বিড়ালের বাবা। আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী।

একদা মদিনার মুনাওয়ারাহ, দাউস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে যুবক আবু হুরায়রা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (আঃ)-এর সাক্ষাত বা কুশল বিনময় হয়। তিঁনি স্বীয় গোত্রের প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসি (রাঃ) দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুশল বিনিময় পর্বে রসূল (সাঃ) (আঃ) আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ? আবু হুরায়রা বললেন, আবদে শামস। আবদে শব্দের অর্থ দাস এবং শামস শব্দের অর্থ সূর্য। অর্থাৎ শব্দদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায় সূর্যের দাস। রসূল (সাঃ) (আঃ) কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন, নাহ! আজ থেকে তোমার নাম হবে আবদুর রহ্মান। আবদুর রহ্মানের অর্থ হলো দয়াময় প্রভুর বান্দা। একথা শুনে আবু হুরায়রা (রাঃ) আনন্দের উচ্ছ্বাসে বললেন, ইয়া রসূলআল্লাহ্! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আপনার কথা মতই আজ থেকে আমার নাম আবদুর রহ্মান। ঐ দিনের পর হতে আবু হুরায়রা (রাঃ) একনিষ্ঠভাবে রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর সাহচার্য অবলম্বন করেন এবং রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সহবতে থাকেন। আবু হুরায়রা দিবা-রাত্রি মসজিদে নববীতে থাকতেন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তিঁনি দাম্পত্য জীবনেও আবদ্ধ হন নি, এভাবে পবিত্র আহলে সুফফাদের সাথেই থাকতেন।

আহলে সুফফা'র সদস্যরা উবাদা ইবনে সামিদের অধীনে কোরআন ও সুন্নাহ'র অধ্যায়ন করতেন, এছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)-এর অধীনেও তাঁরা অধ্যায়ন করতেন। যখন তৎকালীন ইসলামী সরকার ধর্মীয় গবেষণার শিক্ষক হিসাবে কাউকে নিয়োগ দিতেন, তখন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ একজন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হতেন। এছাড়া আহলে সুফফার সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে আমীর হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন।

জাগতিক জ্ঞান দ্বারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে, আহলে সুফফা বাসীরা বসে বসে খেতেন, কোন কাজ কর্ম করতেন না। তাঁরা ছিলেন এবাদত পালনে সত্যিকারের আবেদ, আলিম, মুজাহিদ। আবু হুরায়রা, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, প্রসিদ্ধ সাহাবা তাঁদের বর্ণনাকৃত সহি হাদিস হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এছাড়াও হারিসা ইবনে নুমান, সালিম বিন-উমাই, মুনাইস ইবনে হুদাইফা, সুহাইব ইবনে সিনান বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত হানযালা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। যাকে ফেরেস্তারা দাফনের আগে গোসল দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

রসূল (সাঃ) (আঃ) তাসাউফ বা সুফি কার্যক্রমের মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে একটি জাগ্রত আত্মার অধিকারীগণ সুসংঘঠিত ও সুসংবদ্ধ মুসলিম সমাজ যা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহলে সুফফা গঠন ও পরিচালনা তাঁরই অংশ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রাখতে চাই যে, গৃহহীন এবং অবিবাহিত ও স্বেচ্ছায় আহলে সুফফায় যোগদানকারী হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করবার পর সেখানে গমন করেন এবং রসূল (সাঃ) (আঃ)-এর সাথেই থাকবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁদের জন্য মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট একটি স্থান নির্মিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাদের ভ্রাতৃত্ত্ব বন্ধন বৃদ্ধি পেতে-পেতে ৩০০ জন এবং সর্বশেষ ৪০০ জন সদস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম ৭২ থেকে ৪০০ জন পর্যন্ত এবং হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর পর্দা গ্রহণের পর থেকে তাঁদের প্রত্যেকেই শাসক বা আমীর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। আহলে সুফফাগণ জ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে ধর্মীয় সমস্ত অমিমাংশিত ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বুঝবার বিষয় হলো, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত কি শিক্ষা এখানে পেয়েছিল? যা দ্বারা এই ধর্মের প্রচার এবং প্রসার কার্যে তাঁরা অবদান রেখেছেন।

আসলে আহলে সুফফার মূল আলোচনার উদ্দেশ্য হলো তাঁরা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর আদর্শ নির্মাণের একটি দৃষ্টান্ত এই আহলে সুফফারা। তাঁর নৈকট্য হয়ে বা সহবতে থেকে নিজেদেরকে লোভ, মোহ, মায়া, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে একমাত্র মাবুদের সাক্ষাত লাভের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার যে দৃষ্টান্ত তা আহলে সুফফাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বস্তু মোহ নামক দুনিয়াবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর একনিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। এই সুফফাদের বর্ণনাকৃত হাদিস সমূহ সহি সনদ আকারে প্রকাশিত। এছাড়াও কোরআনুল মাজিদের বহু আয়াতে কারিমা তাঁদের মুখস্থ ছিল, যা পরবর্তীতে সংকলিত হয়। আমরা প্রচলিত ভাষায় শুনে থাকি "সহবতে সালেক" গুরুবাদী ব্যবস্থাতে, আর তাঁরা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর সহবতকারী এবং আত্ম নিয়োগ হয়ে ধর্মের একনিষ্ঠ প্রতিনিধি রূপে জাগ্রত হয়েছিল। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর ওফাত পরবর্তীতে যে সকল সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, হাদিস সম্পর্কিত মতভেদসহ ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার প্রতিনিধি সহ অসংখ্য অবদান বা দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখেছেন। মূলত সুফি আদর্শ আহলে সুফফার সঙ্গে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রশ্ন আসে তাঁরা কোন জ্ঞান অর্জন করেছিল ? যা দ্বারা হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর ওফাতের পর যে সকল বিষয়ে সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তাঁরা সে সকল বিষয়েও সমাধান করেছেন। উত্তর হলো ইহাই এলমে লাদুনির জ্ঞান। ইহাকে সীনাবো সীনার জ্ঞানও বলে। সুফি সাধকের মূল অর্জন মূলতঃ এই এলমে লাদুনি।

মূলত আহলে সুফফাদেরকে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ) নবুয়্যতির শিকড় বলে অভিহিত করেছেন। উঁনারা সমসাময়িক বিষয় যুদ্ধ বিগ্রহ সকল অবয়বে হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-এর নির্দেশ মানার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং ইসলাম ধর্মকে আরব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করিয়ে তাহাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই আহলে সুফফাগণ। তাই তাঁদের আদর্শিক ভাবধারা লালন করে একজন গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে দেহের ভিতরের অবাঞ্চিত ক্রিয়াশীল শক্তিকে বিলুপ্ত করে মহান স্রষ্টার জাগরণের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য সর্ব প্রথম যে বিষয়টি জরুরী, তা হলো স্রষ্টার প্রেম। এই প্রেমই পারে প্রকৃত ব্যবস্থায় উন্নীত করতে। আর এই প্রেমের মাধ্যমে আত্মাকে শুদ্ধ করে স্রষ্টার

প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে মনোনিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কার্যকর রূপ দানে সচেষ্ট হওয়া। ইহাই মূলত আহলে সুফফার আদর্শিক শিক্ষা। তাই এই শিক্ষার দিকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকৃত পক্ষে মানব জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তির মাধ্যমে মানব জীবনকে ধন্য করা। ইহাই ধর্মের মূল আদর্শ এবং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক সূরা কাহাফের ১০ নাম্বার আয়াতে বলেন :- "ইজ্ আওয়াল্ ফিত্ইয়াতু ইলাল্ কাহ্ফি ফাকালু রাব্বানা আতিনা মিল্ লাদুন্কা রাহ্মাতান ওয়া হাইয়ি লানা মিন্ আম্রিনা রাশাদান্।" অর্থ :- "যখন আশ্রয় লইলেন কয়েক জন যুবক কাহাফের (গুহার) দিকে সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দাও তোমার পক্ষ হইতে রহমত এবং ঠিক করো আমাদের জন্য তোমার কাজ হইতে নির্ভুলতা"। উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় উল্লেখ একটি নির্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ যা কিনা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট বিধানের জন্য নিজেকে সোপর্দ করা বা তৈরী করা এবং সেই কর্ম সমূহ যেন বিশুদ্ধ বা নির্ভুল ভাবে মহান স্রষ্টার নিকট গৃহিত হয়। এমন আরাধনায় লিপ্ত থাকার অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যাবার যে প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে, তাহা আসলে মূলত আহলে সুফফাদের কর্মের সাথে মিল খুঁজে পাই। তাই বিজ্ঞ পাঠক বাবা-মায়েদের জন্য উপস্থাপন রাখলাম।

আধ্যাত্মিকতা, তাসাউফ, সুফিবাদ, আহলে সুফফা মূলত মহান স্রষ্টার একান্ত সাক্ষাত বা মিলন লাভের অনুশীলন। তাই যারা এ প্রক্রিয়াতে যেতে চায় না, তারাই মূলত এ সকল কর্মকান্ডের পিছনে আপত্তিকর মন্তব্য করে বসে। যিনি বুঝবেনা তাকে হাজারো দলিল দিলেও বুঝবে না, আর যিনি বুঝতে চাইবে তার জন্য দলিলের প্রয়োজন লাগে না। অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত করলে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হবে।

তাই ধর্মের সকল ফেতনা অপসারণে খান্নাসমুক্ত মানবের অধিকারীগণের নিকট থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক বিধি-বিধান সমূহ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্যলোকের ভান্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে অবগত হয়ে প্রকৃত জীবন বিধান পরিচালনা করাই হলো ধর্মের চরম এবং পরম স্বার্থকতা। সবাই এ বিষয়ে মনযোগী হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাব, এমন প্রত্যাশা রেখে উপস্থিত বিষয় এখানে রাখলাম।

রুহ বিষয়ে আলোচনা

রুহ মহান আল্লাহ্পাকের ভাব-মুর্তি বা অন্তর আত্মা। সাধকের পরিভাষায় ইহাকে পরম আত্মা বলে। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত এই রুহ রূপে। এজন্য রুহকে সৃজনী শক্তিও বলা হয়ে থাকে। রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। যদিও রুহের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ দুরূহ। মহান স্রষ্টার পরিপূর্ণ বিকাশিত রূপ যখন সাধক হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, ইহাই আত্ম পরিচয়ের একটি দৃষ্টান্ত বা পূর্ণতা। নিজের সঙ্গে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই রুহের জাগরণ।

মানব হৃদয়ে রুহ অবিভাবক রূপে নফ্সের কর্তা হয়ে পরিপূর্ণ মানব হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে। আপন স্বরূপ তখন একাকার বা পূর্ণতার ঘোষণা দেয়। যেমন বাবা জুনায়েদ বোগদাদী (আঃ) বলেন :- "লাইসালা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তাআলা"। অর্থ "আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই নেই"। ওলিদের ভাবধারা আল্লাহ্র এবং বান্দার মিলন প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ বটে। সাধক নফ্সের উপর নূর মোহাম্মদের নূরের একটি বিকাশের অবতরণকে রুহ বা পরমআত্মা বলে। অর্থাৎ সাধক তার কর্ম দ্বারা খান্নাসি সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে পারলে রুহ জাগরিত হয় এবং মহান স্রষ্টার রূপের বিকাশ ঘটে।

রুহ আল্লাহ্ স্বয়ং তাই ইহা একটি ধ্রুব সকল বিষয়ের বর্ণনাকৃত অবয়ব হলো এক বচন (Singular Number)। তাই একক সত্ত্বা সকল মানব-মানবীর মধ্যে এই রুহ রূপে আল্লাহ্ অবস্থান করেন। হুজুরপাক (সাঃ) (আঃ)-কে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উঁনি বলেন, রুহ আমার রবের আদেশ, নির্দেশ, কাজ। অপর একটি হাদিস শরীফে এসেছে, "তোমার রবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এমন ভাবে লেগে থাকো, যেন মানুষ তোমাকে পাগল বলে"। ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে পরিপূর্ণ একটি বৃক্ষ (বটগাছ), তেমনি প্রতিটি মানুষের মাঝে বীজরূপে রুহকে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্য বছরের পর বছর মোরাকাবা-মোশাহেদা চালিয়ে যেতে হয়। রুহ জন্ম-মৃত্যুর অধীন নয়, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ বাংলার জমিনে যত প্রচার মাধ্যম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) রয়েছে, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেটে (ইত্যাদি) কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে রুহের মাগফেরাত চাওয়া হয়,

এই ভুলের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কারণ হলো কোরআনের কোথাও লেখা নেই, "কুল্লু রুহিন্ জায়িকাতুল্ মাউত্"। অর্থাৎ "রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে"। কালামপাকে আসছে হলোঃ- "কুল্লু নাফ্সিন্ জায়িকাতুল্ মাউত্"। অর্থাৎ "প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে"। যেহেতু প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে তাই নফ্সের মাগফেরাত চাওয়া যায় কিন্তু রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না, তাই রুহের মাগফেরাত চাওয়া আমাদের অজ্ঞতার নিদর্শন বৈকি। এমন অজ্ঞতার শিক্ষা নীতির উপর আমাদের ধর্মীয় বিধান দাঁড়িয়ে আছে।

একটু বুঝবার জন্য লিখছি আমি যদি প্রার্থনাতে বলি, " আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সুখে থাকো, তাহলে কেমন দাঁড়ায় ?"। চিন্তাশীলদের জন্য বিষয়গুলো ভাববার অনুরোধ রইল। কালের প্রবাহমান ধারাতে হয়ত একদিন সংশোধন, সংরক্ষণ পূর্বক মানুষ এই বলা থেকে রহিত হবে। গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হলে মহান স্রষ্টার সবচেয়ে রহস্যময় সৃষ্টি হলো এই "রুহ" যা স্বয়ং বা নিত্যগুপ্ত আবরণের অলৌকিক রহস্য। অবশ্য অনেক ফকিহগণ রুহ মৃত্যুর বিষয়কে সমর্থন করেন বা মত প্রকাশে স্বীকৃতি দান করেন। এখন আল্লাহ্পাক বলেন, "রুহ আমার (আল্লাহ্র) আদেশ"। তো আদেশ তো মূল ছাড়া হয় না। তাই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে বুঝতে হলে আধ্যাত্মিকতার আলোকে নিজেকে মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে কঠোর অনুশীলন করে পেতে হবে।

মহান আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরাআনুল মাজিদে রুহ সম্পর্কে উল্লেখ নিম্নরূপ ঃ-

১) সূরা বাকারা : আয়াত নং ৮৭ :- "ওয়া লাকাদ্ আতাইনা মুসা কিতাবা ওয়া কাফ্ফাইনা মিম্বাদি বির্রুসুলি" "ওয়া আতাইনা ঈসা ইব্নে মারিয়ামা বাইয়ানাতি ওয়া আইয়াদ্নাহু বিরুহিল্কুদুস" "আফাকুল্লামা জাআকুম্ রাসুলুম্ বিমা লা তাহ্ওয়া আন্ফুসুকুম্ ইস্তাক্বার্ তুম্" "ফাফারিকান্ কাজ্জাব্তুম্ ওয়া ফারিকান্ তাক্তুলুন্"। অর্থ :- "এবং নিশ্চয় মুসাকে আমরা কিতাব দিয়াছি এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা পাঠাইয়াছি তাহার পরে রসূলদেরকে" "এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং রুহুল কুদ্দুস দিয়া তাঁহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি"

"সুতরাং যখনই তোমাদের কাছে আসিয়াছেন কোন রসূল তাহা নিয়া যাহা তোমাদের নফ্স পছন্দ করে না, তোমরা কি অহংকার করো নাই?" "সুতরাং তোমরা কতককে অস্বীকার করিয়াছো এবং কতককে তোমরা হত্যা করিয়াছো"।

২) সূরা বাকারা : আয়াত নং ২৫৩ :- "তিলকা রসুলু ফাদ্দাল্না বাদাহুম আলা বাদিন" "মিন্হুম মান কাল্লামা আল্লাহু ওয়া রাআফা বাদাহুম দারাজাতিন" "ওয়া আতাইনা ঈসা ইব্না মারিয়ামা বাইইনাতি ওয়া আইয়াদ্নাহু বিরুহি কুদুসি" "ওয়া লাও শাআ আল্লাহু মা ইক্তাতালা আল্লাজিনা মিন বাদি হিম মিমবাদি মা জাআত্হুমু বাইইনাতু ওয়ালাকিনি ইখ্তালাফু ফামিন্হুম মান আমানা ওয়া মিনহুম মান কাফারা" "ওয়া লাও শাআ আল্লাহু মা ইক্তাতালু" "ওয়া লাকিন্না আল্লাহা ইয়াফ্আলু মা ইউরিদু"। অর্থ :- "ঐ রসূলগণ আমরা ফজিলত দিয়াছি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর" "তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্ কথা বলিয়াছে কাহারও (সাথে) এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে স্থান করিলেন তাহাদের কেহ-কেহকে" "এবং আমরা দিয়াছি মরিয়মের ছেলে ঈসাকে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং আমরা তাঁহাকে (ঈসাকে) সাহায্য করিয়াছি খুব পবিত্র রুহের দ্বারা" "এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না তাহাদের পর হইতে যাহারা, যাহা তাহাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণগুলি আসিয়াছিল ইহার পরেও এবং কিন্তু তাহারা মতবিরোধ করিল সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কুফরি করিল" "এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত না" "এবং কিন্তু আল্লাহ্ করেন যাহা চাহেন"।

৩) সূরা আন্-নিসা : আয়াত নং ১৭১ :- "ইয়া আহলাল্ কিতাবে লাতাগ্লু ফীদ্বিনেকুম্ ওয়ালা তাকুলু আলাল্লাহে ইল্লাল হাক্কা" "ইন্নামাল্ মাসিহু ঈসাব্নু মারিয়ামা রাসূলুল্লাহে ওয়া কালিমাতুহু" "আল্কাহা ইলা মারিয়ামা ওয়া রুহ্হুন্ মিন্হু" "ফাআমেনূ বিল্লাহে ওয়া রুসূলীহী ওয়ালা তাকুলু সালাসাতুন্" "ইন্তাহু খাইরাল্লাকুম্" "ইন্নামাল্লাহু ইলাহুন্ ওয়াহেদুন্ সুব্হানাহু আইইয়াকূনা লাহু ওয়ালাদুন" "লাহু মা ফীস্সাওয়াতে ওয়ামা ফীল্ আরদে" "ওয়া কাফা বিল্লাহে ওয়াকীলান"। অর্থ :- "হে আহলে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কিছু বলিও না" "নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহ্র রসূল এবং তাহার কথাও আল্লাহ্র" -

"মরিয়মের দিকে তিঁনি (আল্লাহ্) যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ছিল তাঁহার (আল্লাহ্র) রুহ (হুকুম)" "সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনায়ন কর এবং তিন (৩) বলা হইতে বিরত থাকো" "যদি তোমরা বিরত থাকো, তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে" "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনিতো এক ইলাহ (উপাস্য) তিনি ভাসমান সত্ত্বা (পবিত্র) কিভাবে তাঁহার জন্য তোমরা সন্তান (সাব্যস্ত) কর ?" "আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুই তাঁহারই জন্য" "এবং অভিভাবক (উকিল) হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট"।

৪) সূরা মায়েদা : আয়াত নং ১১০ :- "ইজ্ কালাল্লাহু ইয়া ঈসাব্না মারিয়ামাজ্কূরু নেয়েমাতী আলাইকা ওয়া আলা ওয়ালেদাতেকা" "ইজ আইইয়াদ্তুকা বেরূহীল্ কুদুসে তুকাল্লেমুন্নাসা ফীল্ মাহ্দে ওয়া কাহ্লান" "ওয়া ইজ্ আল্লাম্তুকাল্ কেতাবা ওয়াল্ হেকমাতা ওয়াত্ তাওরাতা ওয়াল্ ইন্জিলা" "ওয়া ইজ্ তাখ্লুকু মিনাত্তীনে কাহাইআতীত্ তাইরে বেয়েজনী ফাতান্ফুখু ফীহা ফাতাকুনূ তাইরান্ বেয়েজ্নী" ওয়া তুব্রেউল্ আক্মাহা ওয়াল্ আব্রাসা বেয়েজ্নী" "ওয়া ইজ্ তুখ্রেজুল্ মাওতা বেয়েজ্নী" "ওয়া ইজ্কাফাফ্তু বানি ইস্রাঈলা আন্কা" "ইজ জেতাহুম্ বিল বাইয়্যেনাতে ফাকালাল্লাজীনা কাফারূ মিন্হুম্ ইন্ হাজা ইল্লা সেহ্রুন্ মুবিনুন্"। অর্থ :- "যখন আল্লাহ্ বলিলেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার নিয়ামতের (অনুগ্রহের) কথা জিকির (স্মরণ) কর" "যখন রুহুল কুদ্দুস দ্বারা তোমাকে (ঈসাকে) সাহায্য করিলাম, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় অপরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলিতে" "আর আমি যখন তোমাকে কেতাব এবং হিকমত (বিজ্ঞান) এবং তাওরাত্ ও ইনঞ্জিল শিক্ষা দিলাম" "এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটি হইতে পাখি আকৃতি (সৃষ্টি) তৈরী করিলে অতঃপর তাহাকে ফূঁক দিলে তখন উহা আমার নির্দেশে পাখি হইয়া যাইত" "এবং তুমি আমার নির্দেশে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে" "এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে (কবর হইতে) বাহির করিতে" "এবং যখন বনি ইসরাঈলকে তোমার থেকে আমি বিরত রাখিলাম" "যখন তুমি তাহাদের নিকট বাইয়্যেনাতসহ আসিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের তাহারা বলিল এটাইতো প্রকাশ্য জাদু বৈকি আর কিছুই নহে।

৫) সূরা হিজর : আয়াত নং ২৯ :- "ফা ইজা সাওয়াইতুহু ওয়া নাফাখ্তু ফিহি মিন্ রুহি ফাকাউ লাহু সাজিদিনা"। অর্থ :- "সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজ্দা করো"।

৬) সূরা আন-নাহল : আয়াত নং ০২ :- "ইউনাজ্জিলুল্ মালাইকাতা বির্রুহি মিন্ আম্রিহি আলা-মাই-ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি আন্ আন্জিরু আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনা ফাত্তাকুনি"। অর্থ :- "নাজেল করেন ফেরেস্তাদেরকে রুহের সহিত তাঁহার হুকুম হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন তাঁহার বান্দাদের হইতে যে তোমরা সাবধান করিয়া দাও অবশ্যই ইহা নাই ইলাহ একমাত্র আমি, সুতরাং আমার তাক্ওয়া করো"।

৭) আন-নাহল : আয়াত নং ১০২ :- "কুল নাজ্জালাহু রুহুলকুদুসি মির রাব্বিকা বিল্ হাককি লিইউসাব্বিতাল্ আললাজিনা আমানু ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশ্রা-লিল মুসলিমিনা"। অর্থ :- "তিনিই নাজেল করেন রুহুল কুদ্দুস তোমার রব হইতে সত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হেদায়েত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] জন্য"।

৮) সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত নং ৮৫ :- "ওয়া ইয়াস্আলু নাকা আনি রুহি " "কুল্ রুহ মিন্ আম্রি রাব্বি ওয়া মা উতিতুম্ মিনাল্ ইল্মি ইল্লা কালিলান্। অর্থ :- "এবং আপনাকে রুহ সম্পর্কে তাহারা প্রশ্ন করে" "বলুন, রুহ আমার রবের আদেশ হইতে এবং তোমাদের দান করা হইয়াছে জ্ঞান হইতে সামান্য ব্যতীত নয়" । (বিঃ দ্রঃ এই আয়াতে কারিমায় রুহ শব্দটি দুইবার আসছে)

৯) সূরা মরিয়ম : আয়াত নং ১৭ :- "ফাত্তাখাজাত মিন দুনিহিম হিজাবান ফা আর্সাল্না ইলাইহা রুহানা ফাতামাস্সালা লাহা বাশারান্ সাউইইয়ান"। অর্থ :- "সুতরাং সে (মরিয়ম) তাহাদের হইতে (পরিবার-পরিজন) পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা (আল্লাহ্) তাহার দিকে আমাদের (আল্লাহ্) রুহকে পাঠাইলাম সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (পরিপূর্ণ মানুষ)-রূপে প্রকাশিত হইল"।

১০) সূরা আম্বিয়া : আয়াত নং ৯১ :- "ওয়া-ল্লাতি আহ্‌সানাত্ ফার্‌জাহা ফানাফাখ্‌না ফিহা মিন্ রুহিনা ওয়া জাআল্‌নাহা ওয়া আব্‌নাহা আয়াতাল্-লিল্ আলামিন্"। অর্থ :- "এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাহাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য"।

১১) সূরা শূয়ারা : আয়াত নং ১৯২, ১৯৩ ও ১৯৪ :- "ওয়া ইন্‌নাহু লাতান্‌জিলু রাব্‌বিল আলামিন্"। "নাজালা বিহি রুহুল আমিন্"। "আলা কাল্‌বিকা লিতাকুনা মিনাল্ মুন্‌জিরিন্। অর্থ :- "এবং নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই নাজেল করিয়াছেন জগৎ সমূহের রব"। "নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে বিশ্বস্ত রুহ"। "আপনার কলবের উপর যেন আপনি হন সাবধানকারীদের হইতে"।

১২) সূরা সাজদা : আয়াত নং ০৯ :- "সুম্‌মা সাওয়াহু ওয়া নাফাখা ফিহি মির্ রুহিহি ওয়া জাআলা লাকুমুস সাম্‌আ ওয়াল আব্‌সারা ওয়াল আফ্‌য়িদাতা কালিলাম্ মা তাশ্‌কুরুন"। অর্থ :- "তারপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং ফুৎকার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার [আল্লাহ্‌র] রুহ হইতে এবং দিয়াছেন তোমাদের জন্য শ্রবণ শক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাহা কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো"।

১৩) সূরা সাদ : আয়াত নং ৭২ :- "ফা ইজা সাওয়াইতুহু ওয়া নাফাখ্‌তু ফিহি মিন্ রুহি ফাকাউ লাহু সাজিদিনা"। অর্থ :- "সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজ্‌দা করো"।

১৪) সূরা মমিন : আয়াত নং ১৫ :- "ইউল্‌কির্ রুহা-মিন্ আম্‌রিহি আলা মাই ইয়াশাউ"। অর্থ :- "নিক্ষেপ করেন রুহ তাঁহার আদেশ হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন"।

১৫) সূরা আশ্-শুরা : আয়াত নং ৫২ :- "ওয়া কাজালিকা আওহাইনা ইলাইকা রুহাম্ মিন্ আম্‌রিনা "। অর্থ :- "এবং ঐভাবে আমরা অহি পাঠাইয়াছি আপনার দিকে রুহ আমাদের হুকুম হইতে"।

১৬) সূরা আল মুজাদালা : আয়াত নং ২২ :- "উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল্ ঈমানা ওয়া আইয়াদা-হুম্ বিরুহিম মিন্হু"। অর্থ :- "উহারাই তাহারা, লিখিয়া দিয়াছেন তাহাদের কলবের মধ্যে ঈমান এবং শক্তিশালী করিয়াছেন তাহাদের রুহের দ্বারা তাঁহার পক্ষ হইতে"।

১৭) সূরা তাহরিম : আয়াত নং ১২ :- "ওয়া মারিয়ামা ইব্নাতা ইম্রানা আল্লাতি আহ্সানাত ফার্জাহা ফা নাফাখ্না ফিহি মির্ রুহিনা ওয়া সাদ্দাকাত বিকালিমাতি রাব্বিহা ওয়া কুতুবিহি ওয়া কানাত্ মিনাল্ কানিতিন্"। অর্থ :- "এবং ইমরানের কন্যা মরিয়ম যিনি হেফাজত করিয়াছিলেন তাহার লজ্জাস্থান সুতরাং আমরা ফুৎকার দেই ইঁহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহার রবের বাণীসমূহ এবং তাহার কিতাবসমূহ এবং তিনি ছিলেন অনুগতদের হইতে (একজন)"।

১৮) সূরা মারিজ : আয়াত নং ০৪ :- "তারুজুল মালাইকাতু ওয়ার রুহু ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু খাম্সিনা আল্ফা সানাতিন"। অর্থ :- "উরুজ করে ফেরেস্তার এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহ্র) দিকে এক দিনের মধ্যে যাহার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার বছর"।

১৯) সূরা নাবা : আয়াত নং ৩৮ :- "ইয়াওমা ইয়াকুমুর রুহু ওয়াল মালায়িকাতু সাফ্ফান লা ইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান্ আজিনা লাহুর রাহমানু ওয়া কালা সাওয়াবা"। অর্থ :- "সেই দিন দাঁড়াইবে সারিবদ্ধভাবে ফেরেস্তারা এবং রুহ" "তাহারা কথা বলিতে পারিবে না একমাত্র যাহাকে রহমান অনুমতি (দিবেন) তাহার জন্য এবং সত্য বলিবে"।

২০) সূরা কদর : আয়াত নং ০৪ :- "তানাজ্জালুল্ মালাইকাতু ওয়ার্ রুহু ফিহা বিইজ্নি রাব্বিহিম মিন্ কুললি্ আম্রিন"। অর্থ :- "তাহার মধ্যে (সেই রাত্রিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেস্তাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে"।

রুহ সম্পর্কিত আয়াতের উপর আলোচনা

১। সূরা বাকারা ঃ আয়াত নং ৮৭ :- "ওয়া লাকাদ্ আতাইনা মুসা কিতাবা ওয়া কাফফাইনা মিমবাদি বির্‌রুসুলি" "ওয়া আতাইনা ঈসা ইবনে মারিয়ামা বাইয়ানাতি ওয়াআ্ইয়াদ্‌নাহু বিরুহিলকুদুস" "আফাকুললামা জাআকুম রাসুলুম বিমা লা তাহওয়া আনফুসুকুম ইসতাক্‌বার্ তুম" ফাফারিকান কাজ্‌জাব্‌তুমওয়া ফ্আরিকান তাকতুলুন"। অর্থ:- এবং নিশ্চয় মুসাকে আমরা কিতাব দিয়াছি এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা পাঠাইয়াছি তাঁহার পরে রসুলদেরকে "এবং ঈসা ইবনে মরিয়ামকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং রুহুল কুদ্দুস দিয়া তাঁহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি" সুতরাং যখনই তোমাদের কাছে আসিয়াছেন কোন রসুল তাহা নিয়া যাহা তোমাদের নফ্‌স পছন্দ করে না , তোমরা কি অহংকার করো নাই? সুতরাং তোমরা কতককে অস্বীকার করিয়াছো এবং কতককে তোমরা হত্যা করিয়াছো।

প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ পাক উল্লেখ করলেন এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ এবং রুহুল কুদ্দুস দিয়া তাঁহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি। এই রুহুল কুদ্দুস কে অনেক ফকিহগণ জিবরাইল ফেরেশতা উল্লেখ করেন যা আসলে সঠিক নয়। কারন হল ফেরেশতাকে জাত প্রদান করা হয়নি অর্থাৎ ফেরেশতার নফস ও রুহ কোনটাই নাই। ফেরেশতা সিফাতি নূরের তৈরী আল্লাহর দাস। বিরোধিতা করার শক্তি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি। উদাহরণ ফেরেশতা জিবরাইল (আ:) সিদরাতুল মুনতাহা থেকে হুজুর পাক (সা:) (আ:) কে বলেন এখান থেকে এক কদম যাবার অনুমতি আমার নেই। গেলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব মিরাজ এর বর্ণনাতে অথচ কোরান বর্ণনা করলেন দুই ধনুকের ব্যবধান বা আরও নিকটে। এজন্য ওলিদের বর্ণনায় পাওয়া যায় দোনে হিকা শেকেল এক হায় কিসকো খোদা কাহু" দুজনের চেহারা দেখতে একই তাহলে কাকে খোদা বলব।

জীন এবং মানুষের নফস এর সাথে রুহ কে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম দেওয়া হয়েছে এ কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ (জীন জাতির কথা এড়িয়ে গেলাম) কামেল সাধকগণ খান্নাস মুক্ত পবিত্র নফসের উপর রুহ জাগ্রত ধারণ করে তখন তাদের কথা বার্তা তাদের আদেশ উপদেশ এবং তাদের বাণীগুলো সাধারণ মানুষের কাছে অপছন্দনীয় বা ঝামেলাময় মনে হয়। এ জন্য তারা আর মানতে রাজী হয় না। খান্নাসের কর্তৃত্ব বহন করে পরিচালিত হবার দরুন এমন বিরূপ প্রতিফলন ঘটে এ জন্য প্রকৃত সত্যকে নিরুৎসাহিত করতে দ্বিধাবোধ হয় না। নিজেকে উত্তম মনে করে। তাই যিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন খান্নাস হতে তখন রুহ জাগ্রত হয়ে নিজের উপর বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে ধরাধামে বিচরন করে। তারই সিদ্ধান্ত স্বরূপ আয়াতে কারিমাতে উল্লেখ রয়েছে যে, ঈসা মসিহকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ এবং রুহল কুদ্দুস দিয়া তাঁহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি। অর্থাৎ জীবন রহস্যের পরিচয় বিশেষত স্পষ্টভাবে দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন রুহুল কুদ্দুস দ্বারা। "রুহ" সবার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। যিনি মমিনে রুপান্তর হইয়াছেন। উল্লেখিত কর্ম সম্পাদন দ্বারা তাঁহার রুহ জাগ্রত। রুহুল কুদ্দুস অর্থ স্থান পবিত্র কারী রুহ। কালাম পাকের অন্যত্র আছে আমরা রুহুল কুদ্দুস দ্বারা মোমিনগনকে শক্তিশালী করি। এক কথায় মোমিনের রুহ তাঁহার আপন দেহকে যেমন পবিত্র করিয়াছে তেমনি ভাবে অপর ব্যক্তির দেহকেও পবিত্র করিবার ক্ষমতা রাখে। এবং তাঁহার স্মৃতি বহন কারীস্থান ও পবিত্র। মানুষ ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়ে ভোগ বিলাস ও আরাম প্রিয় এ জন্য এমন ব্যক্তিবর্গ গল্প করতে ভালবাসে। তাই আত্ম শুদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে চায় না। আত্ম অহংকারে (আত্ম শুদ্ধির) বিমুখ থাকে। এ জন্য মহাপুরুষদের মুলধারার বিধান ধরাধামে যাঁরা শিক্ষাদান করে তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ওলি মাশায়েখগনকে অনুস্বরণে গাফেল থাকে এজন্য পূর্ণতা প্রতিফলন হয় না।

২। সূরা বাকারাঃ আয়াত নং ২৫৩ : - "তিলকা রসুলু ফাদ্‌দাল্‌না বাদাহুম আলা বাদিন" "মিনহুম মান কাললামা আল্লাহু ওয়া রাআফা বাদাহুম দারাজাতিন" "ওয়া আতাইনা ঈসা ইব্‌না মারিয়ামা বাইইনাতি ওয়া আইয়াদনাহু বিরুহি কুদ্দুসি" "ওয়া লাও শাআ আল্লাহু মা ইকতাতালা আললাজিনা মিন বাদি হিম মিম বাদী মাজাআতহুম বাইনাতু ওয়া লাকিনি ইকচালাফু ফামিনহুম মান আমানা ওয়া মিনহুম মান কাফারা" "ওয়া লাও শাআ আল্লাহু মা ইকতাতালু" "ওয়া লাকিন্‌না আল্লাহা ইয়াফআলু মা ইফরিদু"। অর্থ :- ঐ রসুলগন আমরা ফজিলত দিয়াছি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর " তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ কথা বলিয়াছে কাহারও (সাথে) এবং মর্যাদায় উর্দ্ধে স্থান করিলেন তাহাদের কেহ কেহকে" "এবং আমরা দিয়াছি মরিয়মের ছেলে ঈসাকে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং আমরা তাঁহাকে (ঈসাকে) সাহায্য করিয়াছি খুব পবিত্র রুহের দ্বারা" "এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না তাহাদের পর হইতে যাহারা, যাহা তাহাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণগুলি আসিয়াছিল ইহার পরেও এবং কিন্তু তাহারা মতবিরোধ করিল সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কুফরি করিল" "এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত না "এবং কিন্তু আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

২ নং সূরা বাকারা ২৫৩ নং- আয়াতের উল্লেখ হলো রসুলগনের উপর কাহাকেও তিনি (আল্লাহ) ফজিলত দান করেছেন (বেশী কম) উল্লেখ আবার কারো কারো সাথে কথা বলিয়াছেন এবং মর্যাদার উর্ধে স্থাপন করলেন কাহাকেও। উল্লেখিত কথা দ্বারা মহান আল্লাহ মর্যাদার বিষয় ও ফজিলতে একজন হতে আরেক জনকে বেশী ঘোষনা টুকো উল্লেখ। যেহেতু এই মর্যাদার বিভাজনটি রসুলগণের মধ্যে তিনি (আল্লাহ) করেছেন সেহেতু এ বিষয়ে কিছু বলা অবান্তর বৈকি? এই বাক্যে একজন হতে অন্য জনকে অধিক পরিমানে আত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ দান করেন ইহাই উল্লেখ। সাধকগণের চাহিদা অনুসারে তিনি এক এক জনকে এক প্রকার ফজল (আত্মিক উৎকর্ষ) দান করিয়া থাকেন। একাগ্রভাবে যে যাহা চায় তাহাই তিনি তাহাদিগকে দিয়া থাকেন। সুতরাং মানুষের উচিত রুহুল কুদ্দুস লাভ করিবার জন্য উচ্চতম ব্যক্তিগণের অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

মহা পুরুষগণ মানুষকে তাহার জীবন ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ময়িরম পুত্র ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) কে উজ্জ্বল প্রমাণ বাইইনাত দান করেছেন। এই বাইইনাত বলতে বা উজ্জল প্রমাণ বলিতে আল্লাহ কি বোঝাতে চেয়েছেন। হয়রত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) দোলনাতে শুয়ে শুয়ে কথা বলতেন। তিন দিনের শিশু অবস্থায় কথা বলার দৃষ্টান্ত শুধু মাত্র ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) এরই পাওয়া যায়। এমন দৃষ্টান্ত উল্লেখ কালামপাকে যাকে উজ্জ্বল প্রমাণ বাইইনাত বলে সাব্যস্ত করেছেন। দোলনায় শুয়ে ঈসা রুহুল্লাহ যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন তখন সেই মানুষেরা অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত। এবং ভক্ত তথা মুরিদ হয়ে যেত। আবার উক্ত আয়াতে কারিমাতে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ রুহুল কুদ্দুস বা অতি পবিত্র রুহ দ্বারা। এজন্য আত্মিক উৎকর্ষ অর্জিত সাধকগন মহাপুরুষের অনুসরণ করে এই রুহুল কুদ্দুস লাভ করেন, সাধকগনকে রুহুল কুদ্দুস দ্বারা শক্তিশালী করা হয়। এখানে আলোচনার আয়াতে কারিমাতে এই রুহুল কুদ্দুসের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। রুহুল কুদ্দুস অর্থ হল স্থান পাক বা পবিত্রকারী রুহ। দেহ এবং বস্তু পবিত্রকারী রুহ। অর্থাৎ শক্তিশালী রুহ সাধকের উপর অবতরণকৃত নূরে মোহাম্মাদী কে রুহ বলে সাব্যস্ত করা হয়। এই রুহ সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধকের দেহ মনকে পবিত্র করিয়া তোলে। তখন এই রুহকে রুহল কুদ্দুস বলে। সেহেতু ইহা স্থান পবিত্রকারী রুহ রুপে প্রতির্ষ্ঠিত লাভ করিয়াছে। আল্লাহর এত বড় প্রমাণ সমূহ দেখার পরও মানুষ উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ না করে পরস্পরে হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হত্যাযজ্ঞ, এমন কি ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে আছে এবং থাকবে, মানুষকে সিমিত ইচ্ছা শক্তি দান করবার দরুন কেহ ঈমান আনবে আবার কেহ কুফুরী করবে। ভাল এবং মন্দের লীলাখেলাটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে অনেক রুপ ও রঙে এবং অনেক রকম লেবাসে। যদি হস্তক্ষেপ আল্লাহ করতেন তাহলে এই হত্যাযজ্ঞের লীলাখেলাটি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত ঘটত। আয়াতে আলোচনা বা পর্যালোচনা বিষয়গুলো মেলে ধরা হলো। পরিশেষে সর্ব প্রকার দোষ (মন্দ) হতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ও জাল্লাশানাহু সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বাধীন।

৩। সূরা আন-নিসাঃ আয়াত নং ১৭১:- " ইয়া আহলাল কিতাবে লাতাগলু ফীদ্বিনেকুম ওয়ালা তাকুলু আলাললাহে ইললাল হাককা" ইননামাল মাসিহু ঈসাবনু মারিয়ামা রাসুলুলল্লাহে ওয়া কালিমাতুহু" "আলকাহা ইলা মারিয়ামা ওয়া রুহহুন মিনহু" "ফাআমেনুবিললাহে ওয়া রুসুলীহী ওয়ালা তাকুলু সালাসাতুন" "ইনতাহু খাইরাললাকুম" "ইননামাললাহু ইলাহুন ওয়াহেদুন সুবহানাহু আইইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদুন" "লাহু মা ফীসসামাওয়াতে ওয়ামা ফীলআরদে" "ওয়া কাফা বিললাহে ওয়াকীলান"। অর্থ:- হে আহলে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কিছু বলিও না" "নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রসুল এবং তাহার কথাও আল্লাহর" মরিয়মের দিকে তিনি (আল্লাহ) যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ছিল তাঁহার (আল্লাহর) রুহ (হুকুম)" সুতরাং তোমরা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি ঈমান আনায়ন কর এবং তিন (৩) বলা হইতে বিরত থাকো" "যদি তোমরা বিরত থাকো, তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে। " নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিতো এক ইলাহ (উপাস্য) তিনি ভাসমান সত্তা (পবিত্র) ভাবে কিতাব তাঁহার জন্য তোমরা সন্তান (সাব্যস্ত) কর? আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুই তাঁহার জন্য" "এবং অভিভাবক (উকিল) হিসাবে আল্লহই যথেষ্ট"।

সূরা আন-নেছাঃ আয়াত ১৭১ :- আয়াতে কারিমার শুরুতেই বলা হলো হে আহলে কিতাবিগণ তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। অর্থ তোমরা তোমাদের ধর্মের মধ্যে গলফাঁস করিওনা বা বাঁধা পড়িয় না। ধর্ম রাশির উপর সালাত যাকাত প্রতিষ্ঠিত না করিলে মোহ বন্ধনে মানুষ বাঁধা পড়িয়া যায় এবং জন্ম চক্রের আবদ্ধে আবর্ত হয়। পরবর্তী বাক্যে বলা হল নিশ্চয় মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহ আল্লাহর রসুল এবং তাঁহার কথাও আল্লাহর। মরিয়মের দিকে তিনি যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ছিল তাঁহার রুহ বা হুকুম। তিনি মহান আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত একজন মহা মানব এবং তিনি আল্লাহর রুহ যাহা আল্লাহ হতে মরিয়মের দিকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মরিয়মের পুত্র কেন বলা হলো?

সবার পরিচয় বহন করে পিতার মাধ্যমে কিন্তু ঈসা মসিহর বেলায় মায়ের পরিচয় তথা নারীর পরিচয়ে কেন পরিচিত করা হল? ইহার প্রধান কারনটি হল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে ভেঙ্গে পিতা ছাড়া ঈসা মসিহর জন্ম গ্রহণ সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। এই ঘটনা গোটা মানবজাতির জন্য বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মহান আল্লাহ। পিতা মাতার মিলনে যে সন্তান জন্ম নেয় সেটা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মরিয়মের দিকে নিক্ষেপ করা এর অর্থ আকাশ পাতাল ব্যবধান, ইহা সবার দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই পিতা ছাড়া ঈসা মসিহকে মরিয়মের দিকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হল জন্মলগ্ন হতেই ঈসা মসিহ আল্লাহর একজন রসুল। কোরানের অন্যত্র নবী বলে স্বীকৃত উল্লেখ রয়েছে। তিনি রেসালত ও নবুয়্যত উভয় গুনে গুনান্বিত। অতঃপর আল্লাহ ঈসাকে আরেক ধাপ উপরে উঠিয়ে বলেছেন কালিমাতুহু" অর্থাৎ আল্লাহর কালাম। তারপর আল্লাহ বলেন যে ঈসা মসিহ ওয়া রুহুন মিনহু এবং তাঁহার (আল্লাহ) হইতে রুহ। এখানে দেখবার বিষয় হল প্রথমে রসুল, ২য় আল্লাহর কালাম অতঃপর আল্লাহ হতে একটি রুহ বলা হয়েছে। বিষয় কি ভাববাদী চিন্তা চেতনার জ্ঞানীগণ সুন্দর উপস্থাপন করে হয়তো জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনাগুলো একদিন উপহার দেবে বা জ্ঞাত করবে। অতঃপর আল্লাহ দৈহিক ভাবে সন্তান জন্ম দেন না। এবং নিজে জ্ঞাতও হন না সুতরাং তিন বলা ইসায়ীদের উচিত নহে। তিন বলা হইতে নিবৃত্ব থাকার মধ্যে তোমাদের একটি কল্যাণ রহিয়াছে কারণ তিন বলিলে সাধারন মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য তিন বলতে কোরান নিষেধ করেছেন। (তিন এর বিষয়টা আমার পরিপূর্ণ বোধগম্য নয়) অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো এক ইলাহ (উপাস্য), তিনি ভাসমান সত্ত্বা (পবিত্র), কিভাবে তাঁহার জন্য তোমরা সন্তান (সাব্যস্ত) কর? আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁহার জন্য অবিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। যেহেতু বিভ্রান্ত লাঘবের জন্য আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি এক ইলাহ অর্থাৎ তাঁহার সর্ব প্রকার অবস্থানের মধ্যে একই উপাস্য রুপে আছেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপমা সহ সকল কিছুই আল্লাহর এবং মুল সত্ত্বা পরিপূর্ণতা দানে মহান আল্লাহই যথেষ্ট।

তিন এর বিষয়ে শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহম্মেদ চিশতী উক্ত আয়াতে ৩ এর বিষয়টি ত্রিত্ববাদ সংক্ষেপে উল্লেখ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হইল। সংক্ষেপে ত্রিত্ববাদ হইল। আল্লাহ সত্ত্বা বিকাশের দিকে তিনটি পর্যায়ে (১) শুদ্ধ পরিমার্জিত শিষ্য পর্যায় (২) হেদায়েত ও দাতা সম্যকগুরু পর্যায় এবং (৩) মহাগুরু মোহাম্মাদ পর্যায়। এই তিন পর্যায় ব্যতীত অবশিষ্ট সবটাই পশু জগত বা অসুরের জগত। ত্রিত্ববাদের কথা বা বিষয়টি সঠিক বুঝিয়া না বলিবার কারণে তিন বলিতে নিষেধ করা হইতেছে। খ্রিষ্টান জনগণ ভুল অর্থে ত্রিত্ববাদ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এজন্য কোরান তাহদিগকে ত্রিত্ববাদের কথা না বলিবার উপদেশ দিতেছে।

৪। সূরা মায়েদা : আয়াত নং ১১০:- "ইজ কালালালাহু ইয়া ঈসাবনা মারিয়ামজকুরু নেয়েমাতী আলাইকা ওয়া আলা ওয়ালেদাতেকা" "ইজ আইইয়াদতুকা বেরুহীল কুদুসে তুকাললেমুননাসা ফীল মাহদে ওয়া কাহলান" "ওয়া ইজ আললামতুকাল কেতাবা ওয়াল হেকমাতা ওয়াত তাওরাতা ওয়াল ইনজিলা" ওয়া ইজ তাখলুকু মিনাততীনে কাহাই আতীত তাইরে বেয়েজনী ফাতানফুখু ফীহা ফাতাকুনূ তাইরান বেয়েজনী" ওয়া তুবরেউল আকমাহা ওয়াল আবরাসা বেয়েজনী" "ওয়া ইজ তুখরেজুল্ মাওতা বেয়েজনী" "ওয়া ইজকাফাফতু বানি ইসরাঈলা আনকা" "ইজ জেতাহুম বিল বাইয়্যেনাতে ফাকালাললাজীনা কাফারু মিনহুম ইন হাজা ইললা সেহরুন মুবিনুন। অর্থ:- "যখন আল্লাহ বলিলেন হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার নিয়ামতের (অনুগ্রহ) কথা জিকির (স্মরণ) কর" "যখন রুহুল কুদ্দুস দ্বারা তোমাকে (ঈসাকে) সাহায্য করিলাম, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় অপরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলিতে" "আর আমি যখন তোমাকে কেতাব এবং হিকমত (বিজ্ঞান) এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিলাম" "এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটি হইতে পাখি আকৃতি (সৃষ্টি) তৈরী করিলে অতঃপর তাহাকে ফুঁক দিলে তখন উহা আমার নির্দেশে পাখি হইয়া যাইত" "এবং তুমি আমার নির্দেশে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে" "এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে (কবর হইতে) বাহির করিতে" এবং যখন বনি ইসরাঈলগণকে তোমার থেকে আমি বিরত রাখিলাম" "যখন তুমি তাহাদের নিকট বাইয়্যেনাতসহ আসিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের তাহারা বলিল এটাইতো প্রকাশ্য জাদু বৈকি আর কিছুই না।

আয়াতে কারিমার শুরুতেই বলা হলঃ- হয়রত ঈসা (আঃ) বলিলেন তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার নেয়ামতের কথা জিকির (স্মরণ) এবং রুহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য সম্পর্কে তুলে ধরা হল মায়ের কোলে বা দোলনায় শিশুটি কি ভাবে মানুষের সাথে কথা বলতে পারে? কেমন করে এই শিশুটিকে কেতাব ও হিকমত দেওয়া যেতে পারে। ইহা একটি ব্যতিক্রম আশ্চর্যজনক ঘটনা বটে। শুধু কিতাব আর হেকমত? সেই সঙ্গে দুই দুইটি প্রসিদ্ধ কেতাব (সহিফা) একটির নাম তাওরাত এবং অপরটির নাম ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছেন দোলনায় থাকা অবস্থায়। আল্লাহর এত বড় অপরিসীম দান সত্যিই মানব জাতিকে ভাবিয়ে তোলে। এ খানেই শেষ নয়, সেই সাথে উল্লেখ হল মাটি দিয়ে একটি পাখির মত আকৃতিতে তৈরী করে তাহাতে আল্লাহর হুকুমে ফুৎকার দিলে উহা সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যেত। দেখবার বিষয় হলো ফুৎকার করে ঈসা মসিহ আল্লাহর হুকুমে তা কার্যকারীতা পায়। কিন্তু পাখির রুহ নেই। এটা থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ধারা গুলো এভাবেই নবী রসুল দ্বারা স্বাক্ষর রেখেছেন মহান আল্লাহ পাক। সেই সঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন আয়াতে কারিমাতে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর হুকুমে ভাল হবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যেত। অতঃপর কথাটি অবাকেরও অবাক করা কথা তা হল মৃত ব্যক্তিদের কে আল্লাহর হুকুমে জীবিত হও। বলার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে যেত। এত নিদর্শন এবং বনী ইসরাঈল থেকে বিরত রাখার কথা উল্লেখ অতঃপর নবী রসুল রুপে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা জঘন্য ভাষায় বলত এটা প্রকাশ্য যাদু। মুলত কাফের যারা তারাই এ ভাবে কালে কালে সত্যের আগন্তককে মেনে নেয়নি। এটাই হয়ত অঘোষিত তকদির বলা চলে। ঈমান আনায়ন শব্দটি তাদের কপালে লিখা নাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক ওলীগণ বলে থাকেন ওলীর দরবারে যাও, ওলীর দরবারে গেলে তকদির পরিবর্তন হয় এটাই সমসাময়িক। কিন্তু আয়াতে কারিমাতে উল্লেখিত ঈসা (আঃ) এর কার্য বিবরণী কোরানে উল্লেখ দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৫। সূরা হিজর : আয়াত নং ২৯:- "ফা ইজা সাওয়াইতুহু ওয়া নাফাখতু ফিহি মিন রুহি ফাকাউ লাহু সাজিদিনা"। অর্থ:- সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজদা করো"।

১৫ নং সূরা হিজর আয়াত -২৯ :- সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে , সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজদা করো"। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ (আমার) ও রুহ উভয়ই এক বচন মূলত আল্লাহ কখনও আমরা এবং কখনও আমি বা আমার ব্যবহার করেছেন। এখানে আদম সৃষ্টি অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ সৃষ্টির সুসংবাদ ভক্তগনের মধ্যকার ফেরেশতাগণকে দেওয়া হইতেছে। সেহেতু ফেরেশতার মত স্বভাব অর্জিত না হলে আদম পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ইহার কারণ হলো ফেরেশতাগণই শুধু আদমের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্ম সমর্পনকারী হইয়া থাকে। মানবীয় প্রবৃত্তি গুলোকে বর্জন পূর্বক বৃত্তি গুলি সুসংবদ্ধ করিয়া কুলুষমুক্ত চরিত্র বানাইয়া আপন রুহের উদঘাটন ঘটাইলে তখন আদম আপন রবের বা গুরুর মহত্ব লাভ করেন। এই পর্যায় ব্যক্তিকে সেজদা দ্বারা (তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া) মুক্তি লাভ করিতে হয়। আল্লাহ বলেন আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ মোট কথা রুহ সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত নহে। রুহ সৃজনী শক্তির অধিকারী প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রব রূপে শাহ্ রগের নিকটে অবস্থান করে।

৬। সূরা আন-নাহল : আয়াত নং ০২:- "ইউনাজজিলুল্ মালাইকাতা বির্‌রুহি মিন্ আম্‌রিহি আলা-মাই-ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি আন আনজিরু আননাহু লাই-লাহা ইললা-আনা ফাততাকুনি"। অর্থ:- "নাজেল করেন ফেরেস্তাদেরকে রুহের সহিত তাঁহার হুকুম হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন তাঁহার বান্দাদের হইতে যে তোমরা সাবধান করিয়া দাও অবশ্যই ইহা নাই ইলাহ একমাত্র আমি, সুতরাং আমার তাকওয়া করো।

১৬ নং সূরা আন-নাহল ০২ নং আয়াতে:- নাজেল করেন ফেরেস্তাদেরকে রুহের সহিত তাঁহার হুকুম হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন তাঁহার বান্দাদের হইতে যে তোমরা সাবধান করিয়া দাও অবশ্যই ইহা নাই ইলাহ একমাত্র আমি সুতরাং আমার তাকওয়া করো আয়াতে কারিমায় প্রথমেই বলা হলো ফেরেস্ততা নাজেল করেন এবং সেই সাথে রুহকে নাজেল করার কথাটি এই আয়াতে সংযুক্ত হয়েছে। ফেরেস্তা এবং রুহ দুইই এক নয়। বরং দুইটি সম্পূর্ন আলাদা এবং ভিন্ন এটাই পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে আয়াতে।

জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল এরা সবাই ফেরেশতা। শুধুই ফেরেশতা কিন্তু রুহ বিষয়টি পৃথক রাখতে আয়াতে কারিমাতে পৃথকভাবে উল্লেখ রাখা হয়েছে। অতঃপর যিনি নিজেকে রুহের জাগরণ সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ গুরু নির্দেশিত মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জিত হলেই কেবল আল্লাহর হুকুম তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা অর্থাৎ এখানে ইচ্ছার উপযুক্ততায় হল পূর্ণতা সকল মানব মানবীর মধ্য হইতে নির্বাচন এবং তাদেরকেই সাবধান করার তাগিদ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এজন্য তাকওয়া করো এবং ভয় করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ একেরই প্রকাশ একেরই বিকাশ তাই একের অর্থাৎ মূলের জাগরণ হলেই কেবল তাঁর বাণীতে এই সাবধান বা সতর্ক বার্তা করানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সেই মহিয়ান গরিয়ান সুমহান স্রষ্টা কি এক অপূর্ব প্রতিনিধিত্বের ধারা এবং এক এক জনকে বিশেষ কর্তৃত্বের ক্ষমতাও দান করেছেন। সার কথা এক বাক্যে বলা হল নাই কোন ইলাহ এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া। বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানময় কোরান।

৭। আন-নাহালঃ আয়াত নং ১০২ঃ- " কুল নাজজালাহু রুহুলকুদ্দুসি মির রাববিকা বিল হাককি লিইউসাব্‌বিতাল আললাজিনা আমানু ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশরা-লিলমুসলিমিনা"। অর্থঃ- " তিনিই নাজেল করেন রুহুল কুদ্দুস তোমার রব হইতে সত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হেদায়েত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] জন্য"।

১৬ নং সূরা আন-নাহালঃ আয়াত নং ১০২ঃ আয়াতে - " তিনিই নাজেল করেন রুহুল কুদ্দুস তোমার রব হইতে সত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং দেহায়েত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] জন্য"। আয়াতে কারিমায় শুরুতেই নাজেল কথাটি এসেছে তাই ইহা কি অতীত কালের মধ্যে ধরে রাখা যায়? ইহা বর্তমান, রুহ নাজেল হইলে উহা নফসের উপর কর্তা হয়ে যায়। এটাই পূর্ণতার অবগাহনের একটি রূপ সাধক জীবনে। অতঃপর তোমার রব হইতে 1st person (তোমাদের) বলা হয়নি অর্থাৎ ব্যক্তি কেন্দ্রিক সাধনার কার্যকরী রূপ। যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য একটি সুসংবাদও বটে। সত্যকে প্রতিষ্টা করিবার জন্য কালে কালে স্রষ্টার প্রনিত প্রতিনিধির প্রতি রুহ নাজেল আয়াতে কারিমায় সেই সাক্ষতা বহন করে চলেছে।

এখানে একটু ভিন্নতা তা হল অনেক তাফসিরকারক তাদের লিখনিতে রুহুল কুদ্দুস অর্থ জিবরাইল উল্লেখ করেছেন এটা আসলে সমিচীন নহে। যেখানে মহানবী হেরা পর্বতের গুহাতে মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজের নফসের উপর রুহের পরিপূর্ণরূপ বিকাশিত করেই নুবয়তের সনদ কার্য শুরু করেন। যারা মোরাকাবা মোশাহেদাতে আগ্রহী নয় তারা রুহ সম্পর্কে অজ্ঞ। এখানে মুসলমানদের কথা এসেছে সুফি মতে এই ভাবধারাকে শুধু আত্মসমর্পণকারীই নয় আরও উর্ধ্বে আল্লাহর দর্শনকে মোসলমান বলে এ কারনে আত্ম পরিচয়ের পূর্ণতা হল রুহ প্রাপ্তি। রুহের পরিপূর্ণ রূপটি যখন সাধকের আপন নফসের উপর প্রতিফলিত হয় উহাকেই নূরে মোহাম্মাদী বলে। আর এই নূরে মোহাম্মাদীকে আপন নফসের উপর উদ্ভাসিত করার সাধনাটিই ইসলামের মূল কথা।

৮। সুরা বনী ইসরাইল : আয়াত নং ৮৫ :- " ওয়া-ইয়াস-আলু নাকা আনি রুহি" "কুল রুহ মিন আমরি রাববি ওয়া মা উতিতুম্ মিনাল ইল্‌মি ইললা কালিলান। অর্থ:- "এবং আপনাকে রুহ সম্পর্কে তাহারা প্রশ্ন করে " "বলুন রুহ আমার রবের আদেশ হইতে এবং তোমাদের দান করা হইয়াছে জ্ঞান হইতে সামান্য ব্যতীত নয়। (বিঃদ্রঃ এই আয়াতে করিমায় রুহ শব্দটি দুইবার আসছে।)

১৭ নং সূরা বনি ইসরাইল ৮৫নেং আয়তে:- বলুন রুহ আমার রবের আদেশ হইতে এবং তোমাদের দান করা হইয়াছে জ্ঞান হইতে সামান্য ব্যতীত নয়। মহানবীকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মহানবী বললেন যে রুহ হলো আমার রবের হুকুম তথা আদেশ। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ সামান্যই বুঝতে পারবে। জ্ঞান দুই প্রকার (ক) পুস্তক অধ্যায়ন পূর্বক অর্জিত জ্ঞান যাকে জাগতিক জ্ঞান বলা হয়। (খ) মহামানবের সংস্পর্শে থেকে তার দেওয়া মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে এলমে লাদুনি বলে। তাই রবের আদেশ মূলত রব ছাড়া আলাদা নয়। এজন্য সাধক বছরের পর বছর মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজের নফসের ভিতরে থাকা খান্নাসী (শয়তান, ইবলিস, মরদুদ, খান্নাস) সত্ত্বাকে বিদুরিত করতে পারলেই রুহ সত্তার উদ্ভাষন ঘটে। আর এই রুহ স্বত্তার উদভাষন হলে রুহের কর্তৃত্বের ধারাতে পরিচালিত হয় সাধক পূর্ণতার মান দন্ডকে কার্যকরী করবার অনুমতি পায়। রুহ সম্পর্কে ভাষায় উল্লেখ দুরুহ।

দর্শনবাদই এই সম্পর্কে পরিপূর্ণতা দান করে। এরপরেও কালামপাকে উল্লেখ এ সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান দান করা হইয়াছে। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ রাখতে চাই তা হল এই এলমে লাদুনির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানীগন কালাম পাকের রুহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করলে তা প্রকৃত সত্য এবং সুন্দর রূপে প্রতীয়মান হয়। হাদিস শরীফে এসেছে রুহ আমার রবের আদেশ, নির্দেশ ও কাজ।

৯। সূরা মরিয়ম : আয়াত নং ১৭:- "ফাততাখাজাত মিন দুনিহিম হিজাবান ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা ফাতামাসসালা লাহা বাশারান সাউইইয়ান"। অর্থ:- "সুতরাং সে (মরিয়ম) তাহাদের হইতে (পরিবার-পরিজন) পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহার দিকে আমাদের (আল্লাহ) রুহকে পাঠাইলাম সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (পরিপূর্ণ মানুষ) রূপে প্রকাশিত হইল"।

১৯ নং সূরা মরিয়াম এর ১৭ নং আয়াতে :- "সুতরাং সে তাহাদের (পরিবার-পরিজন) হইতে পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা তাহার দিকে আমাদের রুহকে পাঠাইলাম সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (মানুষ) রূপে প্রকাশিত হইল"। আয়াতে কারিমাতে প্রথমেই বলা হল মরিয়ম পর্দা গ্রহণ করলেন অর্থাৎ মোরাকাবা মোশাহেদাতে একাকি মগ্ন হলেন অতঃপর আল্লাহ বহু-বচনে আমরা ব্যবহার করলেন এবং একবচনে রুহ পাঠানোর কথা ব্যক্ত করলেন। এবং সেই রুহের রূপ টিও বর্ণনা করলেন বাশার। পবিত্র কোরানের অন্য আয়াতে হুজুর পাক (সাঃ) কে বাশার লকব এ ভূষিত করবার ঘোষণা জেনে থাকি। এই পরিপূর্ণ মানব আকৃতি তথা পুরুষ আকৃতি ধারণ করেন রুহ। তবে রুহ নারী রূপ ধারণ করতে পারে কি না ইহা বোধগম্য নই তবে নারীকে রুহ ফুৎকারের ঘোষণা অন্য আয়াতে কারিমাতে উল্লেখ রয়েছে মোট কথা প্রকৃত সত্য হল প্রেরিত রুহ মরিয়মের কাছে স্বামী রূপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নূরের সন্তান দান করিয়া গেলেন তাই এই নূরময় আলোকবর্তিকা বাশার রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এজন্য জগতে পূর্নতার মানবদের উল্লেখ বাবা জুনায়েদ বোগদাদী বলেছেন "লাইসালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহতালা" আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কিছু নাই। এমন শত সহস্র পূর্ণতার ঘোষণা ওলী, পীর, ফকির, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফ, আবাদানদের ঘোষণা ইতিহাস সাক্ষী বহন করে চলেছে।

১০। সূরা আম্বিয়া : - আয়াত নং ৯১ :- "ওয়া ল্লাতি আহসানাত ফারজাহা ফানাফাখ্‌না ফিহা মিন রুহিনা ওয়া জাআলনাহা ওয়া আবনাহা আয়াতাললিল আলামিন"। অর্থ :-"এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাহাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য"।

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৯১ নং আয়াতে- এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাহাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য"। আয়াতে কারিমায় প্রথম যে বিষয়টা দাঁড়ায় তা হলো সমাজের বুকে অবহেলিত নারীকে ও রুহ ফুৎকার করবার ঘোষণা যোগ্যতার বিবেচনায় উল্লেখ হল সতীত্ব অর্থাৎ পুরুষ বা মেয়ে মানুষ রূপে নিজেকে আত্ম প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই তাকে সতিত্বকে রক্ষা করতে হবে। সতীত্ব কে উল্লেখ পূর্বক মরিয়মের দিকে রুহ ফুৎকার করার ঘোষনা পাই। এখানে আল্লাহ আমরা রূপে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই ছোট থেকে একটি মেয়ে তার সতীত্বকে রক্ষা করে একান্ত স্রষ্টার সান্নিধ্যে আরাধনা বা মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জিত হলেই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাক্ষতা স্বরূপ রুহ ফুৎকারের ঘোষণা। যদিও ইহা মহান আল্লাহর দয়া। কালামপাকে উল্লেখ সর্ব প্রথম বাবা আদম (আঃ) এর মধ্যে রুহ ফুৎকার করেছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) কে রুহ ফুৎকার করেছেন। শুধু তাই নয় তাহাকে বানাইয়াছেন একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য। এখন কথা হল আলেম অর্থ জ্ঞানী। কোরান ঘোষণা করেছে সমস্ত আলমের জন্য বিষয়টি পরিপূর্ণ গায়েব জানার স্বীকৃতি সনদ। ইহা যেন একটি বিস্ময় এর চাইতেও বিস্ময়। আয়াত অর্থ নিদর্শন। তাই ঈসা মসিহকে আল্লাহ পাক একটি নিদর্শন এর উচ্চ নির্দেশন করে রেখেছেন কালাম পাকের স্বীকৃতি সনদ।

১১। সূরা শূয়ারা : আয়াত নং ১৯২, ১৯৩ ও ১৯৪ :- "ওয়া ইননাহু লাতানজিলু রাববিল আলামিন"। "নাজালা বিহি রুহুল আমিন"। "আলাকাবলিকা লিতাকুনা মিনাল মুনজিরিন। অর্থ :- এবং নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই নাজেল করিয়াছেন জগৎ সমূহের রব"। "নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে বিশ্বস্ত রুহ"। "আপনার কলবের উপর যেন আপনি হন সাবধান কারীদের হইতে"।

২৬ নং সূরা শুয়ারা ১৯২ নং আয়াতে - "নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে বিশ্বস্ত রুহ"। "আপনার কলবের উপর যেন আপনি হন সাবধান কারীদের হইতে"। আয়াতে কারিমায় প্রথমেই বলা হল নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে কথাটি দ্বারা আপন নফস হতে মন্দ সত্ত্বাকে মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিয়ে বা মুক্ত করে যে নফসটি বা দেহ কাঠামোটি পূর্ণতা লাভ করেছে। তখন আল্লাহ পাক ঐ নফসের সঙ্গে একাত্বতায় প্রকাশিত হন। রুহ নাজেল মাধ্যমে। তখনই তাঁর দ্বারা দুনিয়াতে প্রতিনিধিত্ব কার্য পরিচালিত হয় এতদ প্রসঙ্গে ঈমাম গাজজালী দর্শন থেকে, "আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম, আমি নিজেকে প্রকাশিত করবার জন্য নিজেই নিজের রূপে বিভোর হলাম, আমি কখনও মুসা, কখনও ঈসা, কখনও জাকারিয়া, এমন কি সর্বশেষ মোহাম্মাদ রূপে অবতার হয়ে দুনিয়াতে স্বীয় কার্য করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছি"। উক্ত বাণী থেকে উপলব্ধি করা যায় যে মহান স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব তাঁর স্বীয় অভিষেক নফসের উপর রুহ নাজেলের মাধ্যমে কর্তৃত্ব কর্ম পূর্ণতা প্রতিফলিত হয়। পরিশেষে বলতে চাই নূরে মোহাম্মাদীর বিস্তৃত ধারা রূপে স্রষ্টার প্রকৃত বিকাশ ও প্রকাশ এবং তাঁর দ্বারাই জগতে সাবধান বা সতর্ককারীগন মহান আল্লাহর স্বীয় ধর্মের কার্য সম্পূর্ণ করেন। ইহাই মহান স্রষ্টার অমোঘ লীলা।

১২। সূরা সাজদা : আয়াত ০৯ :- "সুম্মা সাওয়াহু ওয়া নাফাখা ফিহি মির রুহিহি ওয়া জাআলা লাকুমুস সাম্‌আ ওয়াল আবসারা ওয়াল আফয়িদাতা কালিলাম মা তাশকুরুন"। অর্থ :- "তারপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং ফুৎকার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার (আল্লাহর) রুহ হইতে এবং দিয়াছেন তোমাদের জন্য শ্রবণ শক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাহা কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো"।

৩২নং সূরা সাজদা ৯নং আয়াতে : অতঃপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার (আল্লাহর) রুহ হইতে এবং দিয়াছেন তোমাদের জন্য শ্রবণ শক্তি এবং দর্শন শক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাহা কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো”। প্রথমেই বলতে চাই তা হল প্রতিটি মানুষের সাথে বীজ রূপে রুহ দেওয়া হয়েছে এটাকে পূর্ণাঙ্গ রুহ সঞ্চালন বা কার্যকর ভাবলে প্রতিটি মানব-মানবীই পূর্ণতার অবগাহনে রুহ প্রাপ্ত বলতে হয় কিন্তু ইহা মোটেই ঠিক নয়। গুরু নির্দেশিত মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে আপন নফস হতে (খান্নাস, ইবলিস, মরদুদ শয়তান) মন্দ সত্ত্বা গুলি দুরীভূত হলেই সেই নফসের উপর রুহের জাগরণ ঘটে আর রুহের এই আলোকিত রূপ টিকেই বলা হয় নূরে মোহাম্মাদী এই আলোকে আয়াতে কারিমার প্রথমেই বলা হল অতঃপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার (আল্লাহ) রুহ হতে সেই সঙ্গে শ্রবণ শক্তি, দর্শনশক্তি এবং অন্তঃকরণ। এ প্রসঙ্গে সাধক অনুশীলনগামীগন বলতে পারবে অদৃশ্যবাদ যা সবাই দেখে না বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকরণ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া তরান্বিত হলে বুঝতে পারে যা ভাষায় প্রকাশ করা দূরহ। প্রসঙ্গক্রমে হয়রত মুসা (আঃ) কে আবাদান, প্রথম নদী পার হওয়ার শেষে লাঠি দিয়ে আঘাতে মাঝির নৌকা ফুটো করে দেন এই কারণ ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেন যে জালুত রাজার (জালিম) বহর ছুটেছে তারা ঘাটে কতটুকো দূরত্বে অবস্থান করছিল তাও উল্লেখ পূর্বক ঘাটে নতুন নৌকা পেলে বহরে যোগ করে নিয়ে যাবে, সে কারনে আমি নৌকাটা ফুটো করে দিলাম। নবী মুসা (আঃ), মাঝি, আবাদান সবাই নৌকাতে কিন্তু আবাদানের দূর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যবস্থাই আয়াতে কারিমার শ্রবণ দর্শন ও আন্তঃকরণ হিসাবে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ রাখলাম। সূরা কাহাফের আলোচনার আঙ্গিকে। সেই সঙ্গে মহান আল্লাহ পাক কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মহান স্রষ্টার জাগরণ বা মহাশক্তির প্রকাশ মূলতঃ এক ভিন্ন কোন কিছুই নাই তখনই সাধকের বেপরোয়া আচরণ পরিলক্ষিত হয় যেমন মনসুর হাল্লাজ বলেছেন আনাল হক, আল্লামা ইকবাল বলেছেন দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মানুষকে মুক্ত করেছি আমরাই তোমার কাবাকে বক্ষে ধারণ করেছি আমরাই এবং তোমার কোরানকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমরাই, এর পরেও তুমি বল আমরা আনুগত্য নই? আমরা আনুগত্য না হলে তুমিও দয়ালু নও।

এই যে কন্ট্রাডিকশন মূলক বাণীগুলো একত্রিত শক্তির সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এর বাইরে বহিঃ প্রকাশ ঘটে। দৃষ্টান্ত টুকু তুলে ধরলাম যদিও অপ্রাসঙ্গীক প্রসঙ্গ। এমন ধারাবাহিকতায় মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের কে জানিয়ে দিলেন তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। মানুষের জাগতিক জ্ঞান গরিমা দ্বারা রুহকে ধারণ করা সম্ভব নয়। রুহ সম্পূর্ণ একটি রহস্যময় বিষয়।

১৩। সূরা সাদ : আয়াত নং ৭২ :- " ফা ইজা সাওয়াইতুহু ওয়া নাফাখতু ফিহি মিন রুহি ফাকাউ লাহু সাজিদিনা"। অর্থ :- "সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজদা করো" ।

৩৮ নং সূরা সাদ ৭২ নং আয়াতে :- " সুতরাং যখন আমি তাহা সুষম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাঁহাকে সেজদা করো"। বাবা আদম (আঃ) এর মধ্যে আল্লাহ রুহ ফুৎকার করেছেন আয়াতে কালামে উল্লেখ ওয়া নাফাখতু ফিহি মির রুহি অর্থাৎ আমার রুহ হইতে ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আয়াতে পূর্বেই বাবা আদম দেহকে সুষম করি অর্থাৎ উপযুক্ততা বা পরিপূর্ণতার ইশারা বর্ণনা করেছেন। এবং সর্বশেষ উল্লেখ করা হল রুহ ফুৎকারের পর সেজদা করবার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অনেক ফকিহগণ রুহকে সৃষ্টির অন্তর্গত বলেন কিন্তু মুল ধারার সান্নিধ্যে অর্জন কারীগণ বলেন রুহ সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত নহে। রুহ সৃজনী শক্তির অধিকারী, এক কথায় রুহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রব রূপে বা প্রতিপালক রূপে শাহ্রগের নিকটে অবস্থান করে। একটু ভিন্নতার দৃষ্টান্ত রাখতে চাই তা হল সমস্ত রুহ সৃষ্টির পর তা ৩টি শ্রেণিতে বিভাজন করে রাখা হয়। সাধারন, নবী আম্বিয়া (আঃ), ওলী আউলিয়া। ওলীদের স্থান থেকে একটি রুহ আম্বিয়া (আঃ) দিকে বার বার ছুটে যায় এমতবস্থায় ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর স্মরণতব্য হয়, এমন পর্যায়ে আল্লাহ বলেন, আমার হাবিব কে গোটা বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত ও আম্বিয়াদের সরদার হিসাবে প্রেরণ করব আর ছুটে যাওয়া রুহ দুনিয়াতে আব্দুল কাদের নামে বহি: প্রকাশ হবে তাকে আমি ওলিদের সরদার হিসাবে প্রেরণ করব।

উল্লেখ রাখতে চাই তা হল সকল রুহ এক দিনে সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে কি নামে আবির্ভাব হবে তাও নির্ধারিত। তাই রুহ বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করা আমার মত অজ্ঞানীর সাধ্য নাই। ওলীদের লিখনি থেকে বা ধার করা বিদ্যার স্মরণাপণ্য হয়ে পাঠককুলকে কিছুটা উপস্থাপন করলাম কারণ মওলার সান্নিধ্য লাভে ইহা জ্ঞাত হওয়া অতিব জরুরী।

১৪। সূরা মমিন :- আয়াত নং ১৫ :- “ইউলকির রুহা মিন্ আম্‌রিহি আলা মাই ইয়াশাউ”। অর্থ:- “নিক্ষেপ করেন রুহ তাঁহার আদেশ হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন”।

৪০ নং সূরা মোমিন এর ১৫ নং আয়াতে- “ইউলকির রুহা মিন আমরিহি আলা মাই ইয়াশাউ”। “নিক্ষেপ করেন রুহ তাঁহার আদেশ হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন”। আয়াতে কারিমায় রুহ নিক্ষেপ করবার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রুহ নিক্ষেপের কাজটি পরিচালনা হয়” মূলত আল্লাহর আদেশ হতে। আবার সেই সঙ্গে যার উপর তাঁর ইচ্ছার কথাটি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হল। তাহলে এখানে দেখবার বিষয় হল আল্লাহর আদেশ পাবার যোগ্যতা বা উপযুক্ততা কি ভাবে তৈরী করতে হয় নিজেকে সেই মাফিক নির্মান করতে পারলেই মুলত আল্লাহর আদেশ হতে রুহ নিক্ষেপ করা হয়। প্রশ্ন আসে সেই উপযুক্ততা কি ভাবে তৈরি করতে হয়। হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) হেরা পর্বতের গুহায় ১৫ বছর সময়ের মত অতিবাহিত করলেন মোরাকাবা মোশাহেদাতে। এই প্রক্রিয়াতে মুলত একজন মানুষ আল্লাহর আদেশ হতে রুহ নিক্ষেপের যোগ্যতায় উপণিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে মানুষ বেশির ভাগই এই আমল নীতির দিকে যেতে চায় না। (আল্লাহ) প্রতিটি মানুষের মাঝে রুহকে অতি সুক্ষ রূপে প্রতিটি মানব দেহে বিরাজিত আছেন যা সর্ব সাধারণ এর বোধগম্য হয়না। এ জন্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে উর্দ্ধাকাশে অবস্থান করবার বিলাপকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নেয়। মূলত মোরাকাবা মোশাহেদা করতে করতে যতক্ষণ পর্যন্ত দুই এর অবস্থান সক্রিয় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রুহের বিকাশ ঘটে না। মন্দ সত্ত্বাকে পরিপূর্ণ ভাবে দুরীভূত করতে পারলেই আল্লাহর আদেশ হতে সাধক রুহকে জাগ্রত অবস্থায় দেখে অভূত দেখা বা হতভম্ব হয়ে যায়।

এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে যা সবার বোধগম্য হয় না। এজন্য নিজেকে কার্যকরী ভাবে উপযুক্ততায় নির্মিত করাই সঠিক কাজ বলেমনে করি।

১৫। সূরা আশ-শুরা :- আয়াত নং ৫২ :- "ওয়া কাজালিকা আওহাইনা ইলাইকা রুহাম মিন আমরিনা"। অর্থ :- "এবং ঐভাবে আমরা অহি পাঠাইয়াছি আপনার দিকে রুহ আমাদের হুকুম হইতে"।

৪২ নং সূরা আশ-শুর ৫২ নং আয়াতে- "এবং ঐ ভাবে আমরা অহি পাঠাইয়াছি আপনার দিকে রুহ আমাদের হুকুম হইতে" আয়াতে কারিমাতে প্রথমেই উল্লেখ করা হল ঐ ভাবে এটা একটি রহস্যপূর্ণ কথা কিভাবে? বীজ রুপি রুহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে অবস্থান এর দরুণ মহান আল্লাহ আমরা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইলা শব্দের অর্থ দিকে, আয়াতে কারিমাতে ইলাইকা যার অর্থ আপনার দিকে মন্দ সত্ত্বা মানুষের নফসের সঙ্গে মিশে থাকে কিন্তু রুহ জীবন রগের নিকটে বীজ রূপে অবস্থান করে। তাই এই বীজ রূপের রুহ কে পূর্ণতার প্রতিফলনই মূলত কার্যকরী আমল বা দর্শন বাদ বিষয়ে পরিজ্ঞাত হওয়া। মানুষের মধ্য হতে মূলত তিনটি বিভাজন প্রক্রিয়ায় আল্লাহর বাণী পৌঁছায় (১) তাঁহার বিশেষ বান্দার সহিত কথা বলেন সরাসরি অহির মাধ্যমে। (২) পর্দার বা আবরণের মধ্যেও এলহাম দ্বারা এবং (৩) একজন রসুল পাঠাইয়া তাঁহার মাধ্যমে অর্থাৎ রসুলের কথা আল্লাহর কথা। তাহলে এই প্রক্রিয়াকে আয়াতে কালামে ঐ ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। এজন্য মহানবী হেরা গুহার মত অনুশীলনে নির্জনে একাকী মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে মন্দ সত্ত্বাকে (শয়তান, ইবলিস,খান্নাস, মরদুদ) দেহ ভূবন হতে তাড়িয়ে দিয়ে আপন স্বরূপের উদ্ভাষন বা প্রতিচ্ছবি আপন নফসের উপর বর্তায়। ইহাই রবরূপী আল্লাহর দর্শন বা রুহের পরিপূর্ণ রূপ। তাই সৃষ্টির বিকাশময় ধারাতে একই নীতির যে কার্যকরণ সে বিষয়েই আলোচ্য আয়াতে কারিমাতে উল্লেখ বলে বিবেচিত করি। উল্লেখিত আলোচনা টুকু কিছুটা ইশারা বা ইঙ্গিত সাধকদের জন্য ফলপ্রসু লাভে সচেষ্ট হবে।

১৬। সূরা আল মুজাদালা :- আয়াত নং ২২ :- "উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল্ ঈমানা ওয়া আইয়াদা হুম বিরুহিম মিনহু"। অর্থ :- উহারাই তাঁহারা, লিখিয়া দিয়াছেন তাহাদের কলবের মধ্যে ঈমান এবং শক্তিশালী করিয়াছেন তাহাদের রুহের দ্বারা তাঁহার পক্ষ হইতে।

৫৮ নং সূরা মুজাদালার ২২ নং আয়াতে- উহারাই তাঁহারা, লিখিয়া দিয়াছেন তাহাদের কলবের মধ্যে ঈমান এবং শক্তিশালী করিয়াছেন তাহাদের রুহের দ্বারা তাঁহার পক্ষ হইতে। আয়াতে কারিমায় উল্লেখ হল ঈমানকে কালবে এবং শক্তিশালী রুহের দ্বারা যাদেরকে কোরান উহারাই উল্লেখ করেছেন। এখানে দুইটি পদ একটি হল কালবে ঈমান আর রুহের দ্বারা শক্তিশালী। এতদ প্রসঙ্গে হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) বর্ণনা করেণ যার কালব পবিত্র তিনি পরিপূর্ণ পবিত্র। অপর একখানা হাদিসে আছে কালবে আছে ফুয়াদ (অনুভূতি, গতি প্রবাহ), ফুয়াদে আছে রুহ, অর্থাৎ ফুয়াদ কে ঠিকভাবে পরিচালনা করিলে উহার রুহ প্রাপ্তি ঘটে। রুহের মধ্যে আছে সের (সের অর্থ রহস্য), সেরের মধ্যে আছে (নূরে মোহাম্মাদী), নূরের মধ্যে আছে আনা (আনা অর্থ আমি), আল্লাহ বলেন নূরের মধ্যে শুধু আমি আছি। তাহলে প্রাথমিক ভাবে একজন তাঁর ধর্মের যে ঈমান স্রষ্টা এবং পরকালমুখী বিশ্বাস, এই বিশ্বাস কে আঁকড়ে ধরে গুরু নির্দেশিত মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো চালিয়ে কালবকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে যা বিভাজন বা বিচ্যুতি হবার নহে, এই পরিপূর্ণতা অর্জন কারিকে (পবিত্রতা অর্জন কারীকে) রুহের দ্বারা শক্তিশালী করা হয়। অর্থাৎ মূল কথা হল কেউ তাহাকে এই ঈমান থেকে দূরে বা ধোঁকায় ফেলতে পারবে না এটাই তাঁর অর্জন। যাকে ভাববাদীতে বলা হয় স্রষ্টা দ্বারা পরিচালিত ইহাই মহান আল্লাহর রহস্যময় প্রকাশের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর বটে।

১৭। সূরা তাহরিম :- আয়াত নং ১২ :- "ওয়া মারিয়ামা ইবনাতা ইমরানা আললাতি আহসানাত ফারজাহা ফা নাফাখনা ফিহি মির রুহিনা ওয়া সাদদাকাত বিকালিমাতি রাববিহা ওয়া কুতুবিহি ওয়া কানাত মিনাল কানিতিন"। অর্থ:- "এবং ইমরানের কন্যা মরিয়ম যিনি হেফাজত করিয়াছিলেন তাঁহার লজ্জাস্থান সুতরাং আমরা ফুৎকার দেই ইঁহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহার রবের বাণীসমূহ এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তিনি ছিলেন অনুগতদের হইতে (একজন)"।

৬৬ নং সূরা তাহরিম ১২ নং আয়াতে:- "এবং ইমরান কন্যা মরিয়ম যিনি হেফাজত করিয়াছিলেন তাহার লজ্জাস্থান সুতরাং আমরা ফুৎকার দেই ইঁহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহার রবের বাণীসমূহ এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তিনি ছিলেন অনুগতদের হইতে (একজন)"। আয়াতে কারিমাতে মা মরিয়ম (আঃ) লজ্জাস্থান হেফাজত করার ঘোষনা এসেছে। অতঃপর আমরা ফুৎকার দেই কথাটি ভাবিয়ে তোলে হয়রত ইমরান (আঃ) নবী তাঁহার ঘরে কোন সন্তান ছিল না। নবী পত্নী মসজিদ এ গিয়ে মানত করলেন আল্লাহর নিকট আমাদের ঔরসে সন্তান দান করিলে তা মসজিদে উৎসর্গ করব। অতঃপর সন্তান জন্ম নিল কন্যা। পরবর্তীতে নবীর নিকট ঘটনা বর্ণনা করায় নবী (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে মানত পূর্ণ করার নির্দেশ করলেন এবং তখন থেকেই মা মরিয়ম (আঃ) নিজেকে একাকিত্ব মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত থাকতেন। এবং লজ্জস্থান কে হেফাজতে রাখায় আল্লাহ তাঁহার আমল গ্রহণ করলেন, তাঁরই প্রমান স্বরূপ রুহ ফুৎকার এর ঘোষণা আয়াতে কারিমাতে উল্লেখ। শুধু তাই নয় আরও উল্লেখ তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহার রবের বাণী সমূহ অর্থাৎ ফুৎকারকৃত রুহের কথোপকথন কে রবের বানী হিসাবে উল্লেখ, শুধু তাই নয় (তাঁহার কিতাব সমূহ আল্লাহর বিকাশ বিজ্ঞান কে কেতাব বলে)। সেই সকল রূপের মধ্যে আল্লাহর বিজ্ঞানময় বিকাশ ঘটে। তাহার মধ্যে মানব দেহ উত্তম (মানব মানবী) উক্ত আলোকে কার্যকরী মানব দেহকেও কেতাব বলে। তাই একটি সমন্বয় সাধন কার্য পূর্ণতার ইঙ্গিত সেই সাথে তিনি অনুগতদের হইতে একজন আলোচ্য উল্লেখিত দৃষ্টান্ত সমূহ মা মরিয়ম (আঃ) সকল সফল কার্যকে আয়াতে কারিমায় উল্লেখ করা হইয়াছে যেন আমাদের বুঝতে সহজ হয়।

১৮। সূরা মারিজ :- আয়াত নং ০৪ :- "তারুজুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ ইলাইহি ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু খাম্‌সিনা আলফা সানাতিন"। অর্থ:- "উরুজ করে ফেরেশতার এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহর) দিকে এক দিনের মধ্যে যাহার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার বছর"।

৭০ নং সূরা মারিজ ০৪ নং আয়াত- “ উরুজ করে ফেরেশতারা এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহর) দিকে এক দিনের মধ্যে যাহার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার বছর”। আয়াতে কারিমাতে প্রথমেই বলা হল উরুজ করে উরুজ অর্থ অধিরোহন এ প্রসঙ্গে আরো একটু বলতে চাই তা হল আয়াতে কারিমার সূরাটির নামকরণ হয়েছে মারিজ যার অর্থ উর্ধ্ব গমনের সিঁড়ি বা উর্ধ্ব গমন এর তাৎপর্য আয়াতে কারিমায় প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে অধিরোহন অর্থ উক্ত আঙ্গিকেই প্রকাশ। মূল আলোচনা রুহ সম্পর্কে বলা হল উরুজ করে ফেরেশতারা এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহর) দিকে একদিনের মধ্যে বিষয়টি এখন আপন দেহে মন্দ সত্ত্বা (শয়তান, ইবলিস, মরদুদ, খান্নাস) সহ ৫০ হাজার বছর এবাদত করিলে আল্লাহর দিকে যতটুকু অগ্রগামী হতে পারবে, ফেরেশতা রুহ একদিনে ততটুকু অগ্রসর হতে সক্ষম। তাই আপন নফস যখন মন্দ সত্ত্বাকে দূরীভূত করতে পারে তখন উক্ত নফস ফেরেশতাসম হয় এবং তখন আল্লাহর দয়া লাভের দ্বারা রুহ প্রাপ্তি ঘটে। তখনই অধিরোহন প্রক্রিয়া বা উরুজ ঘটে যা ফেরেশতা এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহর) দিকে এক দিনের মধ্যে অর্থাৎ এক নিমেষেই, যার পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে ৫০,০০০ বছর। এই গণনা মূলত আরবি সন তারিখ এর ৩৬০ দিনে বছর গণনার সাথে মিল পাওয়া যায় না। ইহা মূলত আধ্যাত্মিক একটি গতিসীমা কারণ হল মহান আল্লাহ মানুষ ছাড়া দূরে নয়। তাই তাঁর অবস্থান রুহ রূপে মানুষের মাঝেই। মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে সাধক যখন আপন দেহ ভূবনে বিচরণ করে দর্শন বিষয়ে অবগত হয় সেই ভাবধারার গতিকেই কোরান ৫০,০০০ বছর উল্লেখ করেছেন। মহানবীর মেরাজ সময়কাল ২৭ বছর হতে ৮৭ হাজার বছর সময়ের উল্লেখ দেখতে পাই। অথচ মহানবীর ওজুর পানি তখনও গড়াচ্ছিল এবং আরো কিছু ঘটনা প্রবাহ। সমগ্র কোরানুল মাজিদে ৪ (চার) শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আল্লাহর থাকার ঘোষণা জানতে পারি তাই রুহ বিষয়ে কালাম পাকে উল্লেখ একদিনের মধ্যে বিষয়টি আধ্যত্মিক। এজন্য বলা হয় রুহ রহস্য লোকের ভান্ড এবং বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান দ্বারা ইহার পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে কম জ্ঞান দান করা হইয়াছে কোরান উল্লেখ করেছে।

১৯। সূরা নাবাঃ- আয়াত নং ৩৮ :- "ইয়াওমা ইয়াকুমুর রুহ ওয়াল মালায়িকাতু সাফ্ফান লা ইয়াতাকাললামুনা ইল্লা মান্ আজিনা লাহুর রাহমানু ওয়া কালা সাওয়াবা"। অর্থ :- "সেই দিন দাঁড়াইবে সারিবদ্ধ ভাবে ফেরেশতারা এবং রুহ " " তাহারা কথা বলিতে পারিবে না একমাত্র যাহাকে রহমান অনুমতি (দিবেন) তাহার জন্য এবং সত্য বলিবে"।

৭৮ নং সূরা নাবার ৩৮ নং আয়াতে- "সেই দিন দাঁড়াইবে সারিবদ্ধ ভাবে ফেরেশতারা এবং রুহ " "তাহারা কথা বলিতে পারিবে না একমাত্র যাহাকে রহমান অনুমতি (দিবেন) তাহার জন্য এবং সত্য বলিবে"। পবিত্র কোরানে যতগুলো আয়াত পেলাম রুহ সম্পর্কে, রুহ এক বচনে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতে বলা হল সেই দিন দাঁড়াইবে সারিবদ্ধ ভাবে ফেরেশতারা এবং রুহ, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে আমরা মানুষকে যে রূপে দেখে থাকি (চেহারা), তাহলে নফস কি? আয়াতে নফস বা চেহারার দাঁড়ানোর কথা নেই আছে রুহ তাই একটি মানব মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজের ভিতর থেকে যখন মন্দ সত্ত্বা কে দুরীভূত করে আপন নফসের উপর রুহের উদভাষন ঘটায় তখনই আল্লাহ এবং বান্দার পূর্ণ মিলন কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইহাই ধর্মের পূর্ণতা বা সৃষ্টির স্বার্থকথা। বোখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে বান্দা নফল এবাদত করতে করতে আমার এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যেন বান্দার হাত আমার হাত হয়, বান্দার চোখ আমার চোখ হয়ে যায়, এমন কি বান্দার শরীর আমার শরীর হয়ে যায়। এ কারনে ওলি গাউস কুতুব আবদাল আরিফ সহ ধর্মের অবতারগন এই মহা মিলনের আহবান টুকু করে গেছেন। এতদ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আল্লাহ বলেন যে হাতে আপনি পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন ঐ হাত আমার হাত কোরান ঘোষণা করেছে। আরো রয়েছে, যে হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করল ওটা আমার হাত কোরান। এই পর্যায় হল মানুষের মধ্য হইতে মন্দ সত্ত্বা (শয়তান, ইবলিস, মরদুদ, খান্নাস) সম্পূর্ন বিতাড়িত হলে আল্লাহর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দ্বারা নফস পরিচালিত হয়। সেই অবয়বে এমন কার্য সম্পন্ন হয় যা কোরান ঘোষণা করেছেন প্রিয় হাবিবকে এবং তাহারা কথা বলিতে পারিবে না একমাত্র যাহাকে অনুমতি দিবেন রহমান

মূল বিষয় হল যার দ্বারা পরিচালিত তিনিই সর্বেসর্বা তাই তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতিত আর কোন কিছুই বলা সম্ভব হয় না। এতদ প্রসঙ্গে হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) উল্লেখ করেন আমি নিজ থেকে একটি কথাও বলি না যতক্ষন না প্রত্যাদিষ্ট হই রুহ সৃজনী শক্তির অধিকারীর কারণে বিষয়টি সবাই বুঝতে না পারায় পরকালে বিচারের মাঠ হিসাবে উক্ত আয়াতে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে থাকেন। রুহের আয়াতের মধ্যে এই একটি মাত্র আয়াতে রুহ কে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ হয়েছে। সুফিদের ভাষ্য মতে আল্লামা ইকবাল বলেছেন তুম সব কুছ হো বাতাও তুম মুসলমান ভি হো (আল্লাহ) তুমি সব হয়েছো বলতো তুমি কি মুসলমান হয়েছো? সুফিমতের পূর্ণ কথা আল্লাহকে দেখলে তবেই মুসলমান। তাই সকল দর্শনের মুলকথা একই, বর্ণনা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দর্শন একই।

২০। সূরা কদর :- আয়াত নং ০৪ :- "তানাজজালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ ফিহা বিইজ্‌নি রাব্‌বিহিম মিন্‌ কুললি্‌ আম্‌রিন"। অর্থ :- "তাহার মধ্যে (সেই রাত্রিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেশতাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে"।

৯৭ নং সূরা কদর আয়াত ৪ : - "তাহার মধ্যে (সেই রাত্রিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেশতাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে"। রুহ প্রজ্ঞাবান সত্ত্বা বা আপন আলোকিত সত্ত্বা সাধকের। বছরের পর বছর মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে বিরাট ধৈর্য্য ধারণ করে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে অবস্থান করা রব বা প্রতিপালকের প্রত্যেক আদেশ হতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। আয়তে কারিমাতে সেই রাত্রিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য ভাবে অর্থাৎ বেজোড় রাত্রিতে অবতরণ করে এমন রাত বলতে দিনে যেমন সকল কিছু দেখা যায় বা আলোকিত হয়। আর রাতের আঁধারে সব কিছু অন্ধকারে ঢেঁকে দেয়। তেমন বস্তুবাদের দুনিয়ার সকল প্রকার ভোগ মোহ চরিতার্থ পরিহার করাই হল সকল কিছু থেকে নিশ্চুপ বা নিরুত্তাপ ভাবে মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে মেলে ধরেছেন। আরবিতে লাইল অর্থ রাত আর গাসাকিল অর্থ অন্ধকার তাই সুফিদের রাতের বর্ণনা উল্লেখিত পর্যায়ভুক্ত।

আর জোড় রাত্রি অর্থ সাধকের সঙ্গে মন্দ সত্ত্বা থাকে (শয়তান,ইবলিস, মরদুদ, খান্নাস) ততক্ষণ জোড় আর সকল মন্দ থেকে মুক্ত হলেই কেবল বেজোড় রাত্রিতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হতে। তাই ফেরেশতাগন এবং রুহ যে রাতে আল্লাহর অনুমতিতে অবতরণ করে সেই রাতটিকে বেজোড় এবং শক্তিশালী রাত্রি বলে আক্ষায়িত করা হয়। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক একটি সমন্বয় মূলক উল্লেখ। এবারে যে বিষয়টা রুহ বিষয়ের সঙ্গে বেশীর ভাগ সমস্বয় দেখা যায় তা হল ফেরেশতা, এই ফেরেশতা হল আল্লাহর একান্ত সহকারী তাই রবের আগমন ফেরেশতা উল্লেখ এজন্য অধিকার আসা রুহের কর্তৃত্বের পূর্বে সর্ব প্রকার সহায় বা একান্ত সহযোগী হিসাবে ফেরেশতাদের উল্লেখ দেখা যায়। তাই প্রথমে ফেরেশতা পরে রুহ তবে ফেরেশতা যতই শক্তিশালী হোক ফেরেশতা হতে মানুষ বড়। যাকে কালামপাক উল্লেখ করেছেন আশরাফুল মাখলুক অর্থ সৃষ্টির সেরা, সেরাটাই রুহের দর্শন। এজন্য আমরা দেখতে পাই মহানবী (সাঃ) (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে স্রষ্টার সান্ধিধ্যে নিয়ে যেতে জিবরাইল (আঃ) ফেরেশতা উল্লেখ করেন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমার সীমানা। এর বাহিরে একটু এগোলে আমি শেষ হয়ে যাবো তাই বাকী পথ টুকু আপনি একা যাবেন তাই প্রকৃত মানুষ সত্ত্বার জাগরণ হল রুহের দর্শন লাভ। এটাই পূর্নতা । এ জন্য কোরান মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব বা (ক্রাউন অব দ্যা ক্রিয়েশন) বলে ঘোষণা এসেছে। তাই আয়াতে কালামে উল্লেখ তাহার মধ্যে (সেই রাত্রিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেশতাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে।

নফস সম্পর্কে উল্লেখ

নফসঃ- চিত্তবৃত্তির সকল অভিব্যক্তিকেই নফস বলে। অর্থাৎ (দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অনুভব, অনুভুতি) সমষ্টিকেই নফস বলে। একটি মানব দেহে আমি এবং আমার কার্য বিষয়ই নফস। তাছাড়া মন, রিপু, কামনা, ভোগ, পাপ, অহংকার, সবই নফসের আওত্বাধীন। এতদ প্রসঙ্গে উল্লেখ রাখতে চাই তা হল, যে নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে। (ছিররুল আসরার পৃষ্ঠা-১৮) আয়াতে কারিমা ৯১ঃ ৯-১০ সেই সফলকাম হয়েছে যিনি তার নফসকে পবিত্র করেছে। নফসকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই নফসই সুখ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রনা, জরা-ব্যাধিতে সর্বদা লিপ্ত তাই এই নফস নিয়ন্ত্রণ বা উত্তরণ কার্য সম্পাদন করবার জন্য ধর্মীয় উপদেশ বাক্য প্রদান করা হয়েছে। একটি নফসকে নিয়ন্ত্রণ পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণের চাইতেও কঠিন। সুফি মতের আলোকে পরম আত্মার বাইরে যে সকল কার্য্য সংগঠিত হয় তাই নফসের কার্য। দৃশ্য বলতে দেখা এই দেখাটি প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুর চোখ দ্বারা দেখাকে নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। শব্দ শোনা ইহা কান দ্বারা শ্রবন করে থাকি তাও গুরুর কান দ্বারা শোনা, গন্ধ ইহা নাক দ্বারা গৃহিত হয়, তা গুরুর নাক দ্বারা গ্রহণ, স্বাদ গ্রহণ ইহা জিহবা দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তা গুরুর জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ, স্পর্শ ইহা গুরুময় ত্বক দেহেতে সৃজিত হলে পূর্ণতা পায়। এরপরেও অনুভব এবং অনুভূতি উভয়ই মূলত ভাববাদী ধারাতে কার্যকর রূপ দান করে আর তা গুরু সমন্বয় সাধন কল্পে কার্যকর করা সম্ভব হয় তবে কি দাঁড়ায়? উত্তর হলো গুরুময় যাকে ধর্মীয় ভাষায় তাসাববুরে শায়েখ হবার কার্যকরিতা ফলপ্রসু বা সম্পন্ন ভাবধারা এটাকেই বা এই স্তরকে ফানাফিল্লাহ এর স্তর বলা হয়। এই স্তর থেকে সাধকগণ মওলার দীদার লাভের অগ্রযাত্রায় সামীল হয়। তাই মূলত এই কার্য সম্পন্ন করতে যে বন্ধন তা সবার অনুমেয় নয়। কারণ হল যিনি এই কার্যগুলো করেন তিনিই হারে হারে টের পাবেন। মন্দ সত্ত্বা নামে যা (শয়তান, ইবলিস, মরদুদ,খান্নাস) তা মূলত ধর্মের এই কার্যেই বন্ধন তৈরী করে থাকে তাই এটাকেই যুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ নফসের সহিত যুদ্ধ যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় জিহাদে আকবর বলা হয়।

এই জিহাদে জয় যুক্ত হবার জন্যই সাধককে দীর্ঘকাল যাবত প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবার তাগিদ করা হয়েছে। ফানা সম্পর্কে মহান ওলী হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুববুল্লাহ শাহেন শাহে ওলী আফতাবে ওলি সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল ওলি আতায়ে রাসুল ইয়া মইনউদ্দিন চিশতী আজমেরী সানজারী (আঃ) বলেন কোন ব্যক্তি যদী ফানাফিল্লার স্তর অতিক্রম করে তবে সে দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানীর চাইতে বেশী জানে। তাই এই নফসকে আয়ত্তাধীন করবার জন্যই যুগে যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাদের প্রাকটিক্যাল (ব্যবহারিক) জীবন চালনা পদ্ধতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। নফসের পবিত্রতা মূলত একটি দেহের পূর্ণতার পবিত্রতার সামিল। মহান শ্রষ্টার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভের বিষয়ে কোরান বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আয়াত উল্লেখ পূর্বক আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে বা এই নফস হতে উত্তরণের আহবান করেছেন। যদিও ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে (লকবে) চিত্রায়িত করা হয়েছে জাগতিক ভাষায় এর কিছু বিসর্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বুঝতে হলে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপত্রের সহিত নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই কেবল তা বোধগম্য হতে পারে। উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরানুল মাজিদের আয়াতে কারিমাগুলো দেখবার জন্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল।

সূরা আশ শামস আয়াত নং ৭ :- "ওয়া নাফসিওঁ ওয়ামাসাওয়্যা হা" এবং জীবনেরও যাহা তাহাকে সংগঠিত করিয়াছে তাঁহার(স্রষ্টা)।

সূরা আশ শামস আয়াত নং ৮ :- "ফা আল হামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাক্বওয়াহা" পরিশেষে তাহার পাপ এবং তাহার সাধুতা তিনি তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সূরা আশ শামস আয়াত নং ৯ :- "ক্বাদ আফলাহা মান ফাক্কাহা"। সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে (পাপকে) বিশুদ্ধ করিয়াছে নিশ্চয় সে মুক্ত হইয়াছে।

সূরা আশ শামস আয়াত নং ১০ :- "ওয়া ক্বাদ খা-বা-মান দাসসা-হা"। এবং সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে প্রোথিত করিয়াছে সে নিরাশ হইয়াছে।

সূরা আল ইমরানের আয়াত নং ১৬৩- "হুম দারাজাতুন ইন্দাল্লাহে ওয়াল্লাহু বাছিরুনবিমা ইয়ামালুন"। তাহাদের মর্তবা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের এবং তোমরা যাহা করো সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ইউসুফ আয়াত নং ৫৩:-"ওয়াসা উবাররিউ নাফসী ইন্নাল নাফসা লা আম্মা রাতুন বিষসুই ইল্লা মা রাহিমারাব্বী"। এবং আমি আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছিনা আমার প্রতিপালক যখন দয়া করেন সেই সময় ব্যতীত নিশ্চয় জীবনপাপ বিষয়ে আজ্ঞাদাতা হয়। সত্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল রহিম (দয়ালু)।

সূরা আত্ব তাহরীম আয়াত নং ৮:- "ইয়া আইয়্যুহাললাজিনা আমানু তূবু ইলাল্লাহীতাওবাতান নাছুহান আমা রাব্বাকুম আই ইউকাফফিরি আনকুম সাইয়্যি আ তিকুম ওয়া ইউদাখিলাকুম জান্না তিন তাজ্বরী মিন তাহতিহাল আনহারু ইয়াওমা ইউখাইল্লা হুন নাবিইয়্যা ওয়াল্লাযীনা আমানু মাআহ নুরুহুম ইয়াসয়া বাইনা আইদীহিম ওয়া বি আইমা নিহিম ইয়াকুলুনা রাব্বানা আতমিম লানা নুরানা ওয়া গাফফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"। (হে বিশ্বাসীগন আল্লাহর দিকে তোমরা বিশুদ্ধ প্রত্যাগমনে প্রত্যাগমন কর তোমাদিগ হইতে তোমাদের দোষ সকল নিরাকরণ করিতে এবং যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃ প্রনালী সকল প্রবাহিত হয়। সেই স্বর্গোদ্যান সকলে যে দিবস আল্লাহ সংবাদ বাহককে ও তাহার সঙ্গী বিশ্ববাসীদিগকে অপকৃষ্ট করেন না সেইদিবস লইয়া যাইতে তোমাদের প্রতিপালক সমদ্যুত আছেন তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখ ভাগে ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে এবং তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণকর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী।

সূরা কিয়ামত আয়াত নং ০১:- "লাই উক্বাসিমু বিহিয়াওমিল ক্বিয়ামাতি" নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে শপথ করিতেছি।

সূরা কিয়ামত আয়াত নং ০২:- "ওয়ালা উক্‌সিমু বিন্নাফসিল লাওয়ামাহ" এবং নিশ্চয় (পাপের) জন্য ভৎসনাকারী প্রাণ সম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি ।

সূরা আল ফজর আয়াত নং ২৭:- "ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুত মাইন্নাতুর"। ওহে প্রশান্ত (পরিতুষ্ট) আত্মা।

সূরা আল ফজর আয়াত নং ২৮:- "জিঈ ইলা রাব্বিকা রা দিয়াতাম মারদ্বিয়াহ" তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্টি ও সন্তোষভাজন হয়ে।

সূরা আল ফজর আয়াত নং ২৯:- "ফাদখুলি ফি ইবাদী" আমার দাসদের অন্তরভূক্ত হও।

সূরা আল ফজর আয়াত নং ৩০:- "ওয়াদখুলি জান্নাতী" এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সূরা বাকারা আয়াত নং ১৩৮ :- "ছিবগাতাল্লা হি ওয়ামাল আহসানু মিনাল্লাহি ছ্বিবগাতাওঁ ওয়া নাহনু লাহু আ বিদুন"। আমরা গ্রহন করলাম আল্লাহর রং রঙে আল্লাহর চেয়ে কে বেশী সুন্দর আমরা তাঁরই এবাদত কারী।

সূরা আত্বতীন আয়াত নং ০৪:- "লাকাদখালাকানাল ইনসানা ফী আহসানি তাক্ববীম" সত্য সত্যই আমি মানুষকে অতি উত্তম সংগঠনে সৃষ্টি করিয়াছি।

সূরা হিজর আয়াত নং ২৯:- "ফাইযা সাও ওয়াইতুহু ওয়া নাফাখতু ফিহীমির রুহী ফাক্বাউ লাহুসা জ্বিদিন"। অনন্তর যখন আমি তাহাকে ঠিক করিয়া লইব এবং তন্মধ্যে আপন প্রাণ (রুহ) ফুৎকার করিব। তখন তোমরা তাহাকে নমস্কার করিবে।

সূরা জারিয়াত আয়াত নং ৫১- "ওয়াফী আনফুসিকুম আফালা তুবছিরুন" এবং তোমাদের জীবনের মধ্যে (নিদর্শনাবলী আছে) অনন্তর তোমরা কি দেখতেছনা?

সূরা কাহাফ আয়াত নং ১৮:- "ওয়া ইযি তাফাল্ তুমুহুম ওয়ামা ইয়া বুদুনা ইল্লাল্লাহা ফাউ ইলাল কাহাফি ইয়ানশুর লাকুম রাব্বুকুম মির রাহমাতিহী ওয়া ইউহাইয়্যি লাকুম মিন আমরিকুম মির ফাক্কা"। এবং যখন তোমরা (হে বন্ধুগণ) তাহাদিগ হইতে ও তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চনা করে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।

তখন গহব্বরের দিকে আশ্রয় লইও তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীয় দয়া প্রসারিত করিবেন। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যকে সহজ রূপে প্রস্তুত করিবেন।

সূরা হাদীদ আয়াত নং ০৪- "হুয়াল্লাজিনা খালাক্বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি সিত্তাতি আইয়্যা মিন ছুম্মান তাওয়া আলাল আরশি ইয়ালামুমা ইয়ালিছু ফিল আরদি ওয়ামা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়াসা ইয়ানজিলু মিনাস সামা ই ওয়ামা ইয়ারুজু ফীহা ওয়া হুয়া মা আকুম আইনামা কুনতুম ওয়াল্লাহু বিমা তামালুনা বাছীর"। তিনিই যিনি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মূর্ত সৃজন করিয়াছে তৎপর উচ্চ স্বর্গের উপর স্থিতি করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা উপস্থিত হয় ও যাহা তা হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং যাহা আকাশ হইতে অবতারিত হয় ও যাহা তথায় সমখিত হইয়া থাকে তিনি জ্ঞাত হন এবং যে স্থানে তোমরা থাক তিনি তথায় তোমাদের সঙ্গে থাকেন এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দ্রষ্টা। উল্লেখিত আয়াতে কারিমার উল্লেখ নফসের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান আমাদের কে জানান দিতেছে যা উত্তরণ করবার জন্য নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নফসের পরিবর্তন সাধন প্রক্রিয়া সদা বিদ্যমান যা প্রতিটি মানুষকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য নিজেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব জীবন সফল ও সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এজন্য অবশ্যই জন্মান্তরবাদ এর ধারা বিদ্যমান। উদাহরন হিসাবে সূরা দাহার ১ ও ২ নং আয়াত অনুধাবনের জন্য সুপারিশ রাখা হল। দাহার অর্থ অসীম বা অখন্ড মহাকাল হিসাবে বিবেচিত আর ইনসান অর্থ পূর্ণতার একটি যোগ্যতার উপনীত সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পশুকাল হইতে জীবকে বিবর্তনের ধারায় রুপান্তর করতে করতে মহান স্রষ্টা ইনসানে রুপান্তর করেন। একক ভাবেই তাই মহান স্রষ্টার প্রকৃত বিধি নিষেধ লইয়া জগতে তাঁরই প্রতিনিধি গন আগমন করেন এই মানুষকে ইনসান পর্যায়ে উপনিত করার প্রয়াশ থাকে সদা সর্বদা। এজন্য ইন্দ্রিয় শক্তির সঠিক আমলের কার্যকরণ সফল ভাবে সু-সম্পন্ন করতে পারলে মহান স্রষ্টার দয়া প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিনিধির কার্যকরণ করবার উপযুক্ত মর্যাদায় ভূষিত হয়। এমন নিয়ন্ত্রণগামী ব্যবস্থা শুধু মাত্র সুফি মতাদর্শেই পরিচালিত। এই ধারাবাহিকতায় কার্যকরণ ব্যবস্থাগুলোকে নগদ ব্যবস্থা বলে জারি করা হয়।

যেমন নফসে মুৎমায়িন্নাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর জান্নাত আর জীবিত থাকতে কোন মানব তার আমল নিতির সঠিক প্রয়োগ এর ধারাতে পূর্নতায় উপণীত হলে সে মুৎমায়িন্না নফসের অধিকারী। তখন তাকে আল্লা্হর দাস ভূক্ত এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। বিষয়টি পাঠক কুলের একটু উপলব্ধি বোধ জাগ্রত করবার জন্য উল্লেখ রাখলাম। যদিও বিষয়টি চিন্তাশীল জ্ঞানীদের জন্য প্রযোজ্য। যারা মৃত্যুর পর পাবে তাদের জন্য বিষয়টি প্রযোজ্য নয় বলে জ্ঞাত করি। মহান আল্লাহ পাক দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ অনুভব, অনুভূতি এগুলো পরিচালনা করার যে সকল ইন্দ্রিয় সমূহ প্রেরণ করেছেন। তা মূলত: পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। তাই আল্লাহর বিধান সমূহ অনুযায়ী ইন্দ্রিয় শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিতে পারিলেই ইনসান পূর্নতা পায়। আর নিজের আপন ইচ্ছায় ইচ্ছাধীন করিয়া ইন্দ্রিয় শক্তিকে ব্যবহার করিলে সিরাতুল মুস্তাকিম এর পথ থেকে দুরীভূত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া কাফের এর দলভুক্ত হিসাবে নিজেকে উপনীত করে। এমনি ভাবে মানুষ বিপথগামী ও মূলধারা থেকে বিচ্যুতির দিকে ধাবিত হয়। এজন্য নিজের নফস কে চিনলে আল্লাহকে চেনা যায় মহানবী বলেছেন। তাই সুফিদের মূল কার্য হলো, প্রতিনিয়ত নিজের নফসকে আয়ত্বাধীন করবার সাধনা চলমান। এটাই ধর্মের মুল কার্য বলে বিবেচিত। তাই সকলের প্রতি আবেদন হল নিজেকে চেনার পথ ধরে আমলনীতির কার্যকরণ সফল করবার উদাত্ত আহবান রাখি। যেন মানুষ হিসাবে সৃষ্টিতে আগমনের যথার্থতা ও পূর্ণতার প্রতিফলন বাস্তবায়িত হয়। মহান আল্লাহ সহায় হউন। (আমীন)

নফসের প্রকার ভেদ ঃ-

নফস মুলত তিন প্রকার যথা:- ১) আম্মারা নফস (২) লাউয়ামা নফস (৩) মুৎমাইন্না নফস। এছাড়া আরও দুইটি নফসের উল্লেখ দেখা যায় তা হল নফসে মূল হেমার ও নফসে রহমানিয়া।

১। নফসে আম্মারা ঃ-

অতিব সূক্ষতা অবলম্বনে এই নফস মন্দ কর্ম সম্পাদন করে থাকে এটাকে শয়তানী নফসও বলে। ইহা আকামের গুরু ঠাকুর। নফসে আম্মারা সম্পর্কে পবিত্র কোরানুল মাজিদ ১২ঃ ৫৩ (সূরা ইউসুফ -৫৩ নং আয়াত) ইন্না নাফসা লা আম্মারুতুম বিচ্ছুয়ে ইল্লামা রাহিমা রাব্বি।

নিশ্চয় নফসে আম্মারা বদ কাজ করায় যাদের প্রভু রহমত করেন তাদের ছাড়া উল্লেখিত আয়াতে কারিমাতে নফসে আম্মারা দ্বারাই মানুষ মন্দ কর্ম সম্পাদন করে তাই এ বিষয়ে রক্ষা পাবার উত্তম ব্যবস্থা হল মহান স্রষ্টার রহমত লাভ করা। এজন্য মহান স্রষ্টার রহমতের কার্য্যকে আঁকড়ে ধরতে পারলে উত্তরণ সম্ভব হয়। তাই পরিবর্তনের প্রচেষ্টার প্রথম সিঁড়ি হল গুরুবাদ ব্যবস্থায় আত্মসর্মপন এবং মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত থাকলে ধীরে ধীরে মহান স্রষ্টার রহমত লাভ করা সম্ভব হয়। যদি প্রভুর দয়া হয়। এজন্য আয়াতে কারিমায় জানান দেওয়া হল নিশ্চয় নফসে আম্মারা বদ কাজ করায়, যাদের প্রভু রহমত করেন তাঁদের ছাড়া। কি এক আজব ঘোষণা কালাম পাকের। বাংলা তৎসম প্রতিশব্দে ঐ নফসে আম্মারাই (ষড় রিপুর) তম গুন। তম অর্থ অন্ধকার, অধার্মিকতা, অজ্ঞানতা ও পাপের অন্ধকার। এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে। "তমোস জোতির্গ ময়"। অর্থ অন্ধকার হতে প্রভু আমাকে আলোতে নিয়ে চলো।

২। নফসে লাউয়ামা ঃ-

যিনি নিজেকে পরিবর্তনের জন্য কঠোর রিয়াজত এবং মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত। অর্থাৎ নিজের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে জাগ্রত এক কথায় ইহা জিহাদ রত নফস। আপন প্রবৃত্তির তাগুত থেকে নিজেকে বরণ করবার জন্য কঠোর সাধনাতে লিপ্ত। নিজের দ্বারা ভুল হলে বারবার অনুতাপ এবং তওবাতুন্নেছা অর্থাৎ শুদ্ধ সরল অন্তকরণ, প্রতিষ্ঠার জন্য অবারিত ভাবে কার্য পরিচালনা করেন। হুজুর পাক (সাঃ) (আঃ) বলেন আশাদ্দোল জেহাদে জোহাদ্দোল হাওয়া। অর্থাৎ নিজের নফসের সহিত যুদ্ধ জেহাদে আকবর বা শ্রেষ্ঠ জেহাদ। সুতরাং নফসের এই স্তর অতিক্রম করতে পারিলেই সফলতার দ্বার উম্মুক্ত হয়। পবিত্র কোরআনুল মাজিদে সূরা কিয়ামত আয়াত ১, ২ (১) লাউকসিমু বিইয়ামিল কিয়ামিতি (২) ওয়ালা উকসিমু বিননাফ সিল লাউয়ামাহ।

১) না আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে মহাপ্রলয়ের দিবসের সহিত ২) এবং না আমি অঙ্গীকার করিতেছি নফসে লাউয়ামার সহিত এখানে বিবেচ্য বিষয় হল কোথায় সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক অঙ্গীকার করিতেছে মহা প্রলয়ের আর এই পৃথিবী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রহ এখানে বসবাস রত ৭০০ কোটির অধিক মানুষ তাও আবার সেই মানুষের মধ্য হইতে উত্তরণ হবার

সাধনাতে লিপ্ত নফস যাকে জিহাদ রত নফস বা লাউয়ামা নফস বলে মহান স্রষ্টা এই নফসের কসম খাইতেছেন। বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এই ক্ষুদ্র মানুষের ভিতর কত পরিবর্তণ সাধনায় রত নফসের কসম খাইতেছেন এটা ভাবিয়ে তোলে, বিরাট চিন্তার বিষয়। উল্লেখিত আয়াতে প্রথমেই কেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত প্রতিটি মানুষ কে মহান স্রষ্টা কেয়ামতের অধিন করে বানিয়েছেন। সব কিছু এক দিন ধ্বংস হয়ে যাবে এটাকে কেয়ামতে কবির বলা হয় আর সুফিদের দেহ কেন্দ্রিয় বা আত্মজাগরণ মুলক কার্যে ব্যক্তির বা নফসের মুত্যর স্বাদ গ্রহণকে কেয়ামতে সগীর বলা হয়। আমরা যেহেতু আত্মজাগরণ বা দর্শনবাদ বিষয়ে কর্ম পরিচালনা নিয়ে কার্য পরিচালনা করি, তাই কেয়ামতে সগীর হল মূলের কার্য সম্পর্কে অবগত করাইতে মহান আল্লাহ শপথ করেছেন বা সতর্ক করেছেন। তাই কেয়ামতে সগীর সম্পন্ন সময়ের অবস্থা অবগত হওয়ার পূর্বেই সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য সতর্ক করছে কোরান। মূলত লাউয়ামা নফস ধর্মের আঙ্গিকে অর্থাৎ ধর্মের নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ এর অঙ্গিকে সৎ জীবন পরিচালনাকারী নফস মৃত্যুর সময় বা কেয়ামতে সগীর দ্বারা নফস সমগ্র সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার প্রথা চলমান থাকার পূর্বেই নিজেকে সংশোধন ও সংবরণ করবার তাগিদ দিচ্ছে কোরান বার বার আমাদেরকে। যেহেতু বান্দা যে কর্মই করুক না কেন তার রুপ, ঢং, শৈলী আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। গৃহীত হয় হল মনের তাকওয়া বা নিয়ত। এজন্য প্রকৃতপক্ষে একজন মানব- মানবী ধর্মের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নফসে লাউয়ামা পর্যন্ত উপনীত হয়েছে তাই মহান আল্লাহ পাক লাউয়ামা নফসের কসম দ্বারা তাগিদ করেছেন কার্য দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য।

মূলত নফসে লাউয়ামাকে জেহাদরত নফস বলা হয়। আমার পীর ও মোরশেদ বলতেন বাবা ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিস্তৃত একটি পথ। এই পথে উত্তরণ হলে পূর্ণতা পায়। এতদ প্রসঙ্গে বাবা ইব্রাহিম আদহাম বলখি (আঃ) বলেন অনেক লোকই দিনে অন্তত পাঁচবার মুখ ধৌত করে। কিন্তু পাঁচ বছরেও একবার অন্তর ধোয়ার কথা চিন্তা করে না। অন্তর সংশোধন মূলক কার্যই মুলত নফসে লাউয়ামা করে থাকে। যা দ্বারা মানুষ মূলের ধারাতে বেগবান ও কার্যকারীতা লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে আমরা এখন ঈমামুল আউলিয়া বাবা বায়োজিদ বোস্তামীর (আঃ) ঘটনা টুকু উল্লেখ রাখতে চাই। ঈমাম বায়োজিদ বোস্তামির পীর ঈমাম জাফর সাদিক (আঃ) পীরের ধ্যান করবার মোরাকাবাটি শিখায়ে চার বছরের জন্য মোরাকাবা মোশাহেদাতে পাঠালেন। চার বছর পর যখন বাবা বায়োজিদ ফিরে এলেন তখন পীর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বললেন বাবা পাশের ঘরে তাকের উপর রাখা কোরানটা নিয়ে এসো বাবা বায়োজিদ। আদেশ অনুযায়ী কোরান টা নিয়ে এসে পীর বাবার হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পীর বাবা বললেন বাবা তোমার মোরাকাবা মোশাহেদা সফল হয়নি বা তুমি ফেল করেছ। পুনরায় একই আমল নীতিতে তুমি গমন কর। বাবা বায়োজিদ পুনরায় চার বছর একই আমলের কার্য নিয়ে গমন করলেন। অতঃপর চার বছর পর যখন ফিরে এলেন পীর বাবার সান্নিধ্যে তখন পীর বাবা একই আদেশ করলেন বাবা পাশের ঘরে তাকের উপর রাখা কোরান টা নিয়ে এসো এবার বাবা বায়োজিদ খালি হাতে ফিরে এলেন। পীর বাবা মুখে হাসি নিয়ে বাবা বায়োজিদ কে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা তোমাকে তো পাশের ঘরে তাকের উপর রাখা কোরানটা নিয়ে আসতে বলেছি তখন বাবা বায়োজিদ বলেন বাবা আমি তো তাকের উপর কিছু দেখতে পাইনি। এবার পীর বাবা বলেন তা হলে তুমি কি দেখতে পেলে। বাবা বায়োজিদ বলেন আমি আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। এবার বাবা জাফর সাদিক হাসি দিয়ে বলে হাঁ বাবা তুমি সফল হয়েছো। পুনঃরায় পীর বাবা আরো কিছু নিয়ম নীতি সহ আমল শিখিয়ে দিয়ে আবার চার বছরের জন্য মোরাকাবা মোশাহেদায় পাঠালেন। পীরের হুকুমে পুনঃরায় চার বছর মোরাকাবা মোশাহেদায় পূর্ণতার অবয়বে একটি পর্যায়ে এসে বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলে ফেললেন আনা সুবাহানি মা আজিমুশশানি আমি সুবহানি সমস্ত শান আমারই এই পর্যায়কে লাওয়ামা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া বা পূর্ণতা প্রাপ্তি বুঝায়। যাকে তরিকতের ভাষায় লাহুত মোকাম বা আল্লাহ এবং বান্দার মিলন পর্যায়ভূক্ত স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এখানে একত্ববাদ বা তৌহিদ রাজ্য এ রাজ্যে প্রবেশের জন্য এত নির্দেশ নামা ও কার্যকরণ পরিচালনার তাগিদ। এই কার্য সম্পন্ন করার জন্য মহা মানবদেরকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এক কথায় নিজ নফসের সঙ্গে ফানা হবার কার্যই মূলত নফসে লাউওয়ামার কার্য তাই এই নফসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই পর্যায়ভুক্ত নফসটি ২য় স্তর।

অর্থাৎ একটি স্তর অতিক্রম করে সে এই স্তরে পৌঁছেছে। এই স্তরে সদা ভাল এবং মন্দের পৃথক ব্যবস্থা নিজের মধ্যে উৎগীরণ হয়ে থাকে। তাই সদা সর্বদা মন্দ পরিহার পূর্বক নিজেকে ভালোতে উত্তীর্ণ করার যুদ্ধ সদা সর্বদা চালিয়ে যেতে হয়। এজন্য মহান আল্লাহ এই নফসে লাওয়ামার কসম করেছেন বলে মনে করি। অনন্ত অসীম কার্যকে সম্পন্ন করবার মানসে সাধককে সদা সর্বদা কার্য পরিচালনা করে যেতে হয়। সফলতা না হওয়া পর্যন্ত ইহা চলমান।

৩। নফসে মুৎমায়িন্নাঃ-

মুৎমায়িন্না নফস কে পরিশুদ্ধ বা পরিতুষ্ট আত্মা বলা হয়। এক কথায় যে আত্মা সফল হয়েছেন পবিত্র কোরানুল মাজিদে এই মুৎমায়িন্না নফসকে জান্নাতের সু সুংবাদ প্রদান করার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু কি তাই তৎসঙ্গে আল্লাহর দাসদের দলভূক্ত হবার ঘোষণা দেখতে পাই। কোরানুল মাজিদে আমানু, ইনসান, বাশার ইত্যাদী লকবধারীকে জান্নাতের সু সংবাদ প্রদান করার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি নাস এবং ইনসান শব্দদ্বয় মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই চলমান দুনিয়াতে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে জান্নাত লাভের যে মোহ আর মত্ততা একটি বিস্তৃত ভাব ধারায় কার্যকর রূপ পেয়েছে মানুষের মন মগজে জাগতিক কিছু বিধি নিষেধ জারিয়া হয়ে আছে। এগুলো পালন করলে সে জান্নাতে যাবে এবং বদ্ধমুল ধারনার উপর ধর্মের কার্য সম্পন্ন করে থাকে। অথচ নফস কি অনেকে তাও জানে না। এমন অবস্থায় এই সকল মানুষকে ধর্মের মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করা এই আধুনিক যুগে সত্যিই কষ্টসাধ্য বটে। কারণ তাদের উপস্থাপন, রং, ঢং, শৈলীর সঙ্গে মিশ্রণ না ঘটলে তারা মূলের কথাও পরিহার করতে পিছু পা হয় না। এহেন বিষয় থেকে উত্তরণ জরুরী বলে মনে করি। তাই ওলি মাশায়েখসহ আলেমেদ্বীণগন কার্যকর ভূমিকা রাখতে আবেদন রাখলাম। এতদ প্রসঙ্গে তাপসী রাবেয়া বসরীর অমীয় বাণী, আল্লাহ আমি যদি জাহান্নামের ভয়ে তোমার বন্দেগী করি তাহলে আমাকে জাহান্নামে ফেলে দাও আর যদি আমি জান্নাতের লোভে বন্দেগী করি তাহলে আমাকে জান্নাত দিওনা। আর যদি একমাত্র তোমারই সান্নিধ্যের আশায় বন্দেগী করে থাকি তাহলে তুমি (আল্লাহ) আমাকে দেখা দাও।

সাধকসাধীকার তপস্যার বন্দেগী আর চলমান ব্যবস্থা পত্রের নিয়মনীতি পাঠকদের বিবেকের জিজ্ঞাসায় জবাব খুঁজার আহবান রইল। মুৎমায়িন্না নফস সম্পর্কে পবিত্র কোরানুল মাজিদ সূরা ফজর এর ২৭,২৮, ২৯ ও ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুৎমায়িন্নাতুর ইরজি ইলা রব্বিকা রাদিয়া তাম মারদিয়া ফাদখুলি ফী ইবাদী ওয়াদখুলি জান্নাতী।

২৭) ওহে প্রশান্ত আত্মা

২৮) তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হইয়া।

২৯) আমার দাসদের অন্তর্ভূক্ত হও।

৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সুতরাং- আয়াতে কারিমায় সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় জানান দিতেছে মুৎমায়িন্না নফসকে। সাধক তার আমল এর দ্বারা অর্থাৎ মোরাকাবা মোশাহেদাতে যখন নফসে লাউয়ামা থেকে উত্তীর্ন হয় তখনই এই কার্য সুসম্পন্ন হবার আহবান তিনি পেয়ে থাকেন রবের পক্ষ থেকে। তাকে এই যে সুসংবাদ প্রদান করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই আত্মার আর কোন প্রকার কষ্ট জ্বালা থাকে না সে তখন রবের দাসভূক্ত একটি সনদে ভূষিত হন। অনন্ত শান্তির বার্তা সে তখন অবোলোকন করে। কার্যত পূর্ণতার স্বাদ বাস্তবতাতে সে পেয়ে থাকে। কর্ম যজ্ঞ ব্যবস্থা পত্র রবের দাস হিসাবে গণ্য হয়ে কার্য সম্পাদনতব্য করে থাকে। এমন নগদ হিসাব অথচ বাঁকীর কার্য নিয়ে আমরা সদা ব্যস্ত। এজন্য সকলকে নগদ হিসাব সম্পর্কে চিন্তা ও কার্য পরিচালনার জন্য কিছু সময় ব্যয় করবার উদাত্ব আহবান রাখি। আমাদের আপন স্বত্ত্বার সহিত আত্মার সংমিশ্রণ থাকা অবস্থায় নফসকে মুৎমায়িন্নাতে উপণীত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ হল মৃত্যু নামক ঘটনা দ্বারা সত্ত্বা ও আত্মার বিভাজন হয়ে থাকে এবং নফসের হিসাব নিকাশ অন্তে ব্যবস্থা পত্র পেয়ে থাকে। তাই তরিকতের পরিভাষায় ফানা ও বাকায় অবস্থান নিশ্চিত করাই এ পথের মূল কার্য বলে বিবেচিত করি। মহান আল্লাহ পাক তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের পথে কবুল, মঞ্জুর ও কার্যকর রূপদানে গ্রহণ করুণ এটাই প্রত্যাশা।

ধর্মের স্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর হবে। সৃষ্টির যথার্থতা সুন্দর ও কল্যাণকর অবস্থায় পৌঁছে যাবে এই কামনায় আলোচনা টুকু উপস্থাপন করলাম। চলমান কোন বিধি নিষেধকে খাটো করার জন্য নয়। মুলধারার পথে উক্ত আলোচনা টুকু সহায় হিসাবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ সহায় হউন। (আমিন)

৪। নফসে মূলহেমার ঃ-

ওলীদের বিন্নাস অনুযায়ী এটি আত্মার আর একটি পর্যায়ভূক্ত অবস্থা যাকে মহান আল্লাহ পবিত্র কালাম পাকের (৯১ঃ ৭,৮) আন্নাফছে অমা দাওয়াহা ফা আল হামাহা ফাজুরাহা আক্বওয়াহা। কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে আকৃতিতে সুঠাম করেছেন অতঃপর তাকে তার মন্দকর্ম ও তার তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন। অর্থাৎ সুঠাম আকৃতির ঘোষণা এবং মন্দ কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হবার জ্ঞান দান করার ঘোষণা কোরান দিতেছে এই ধারাকে ওলীদের ভাষায় এলহাম প্রদান করা বুঝানো হয়ে থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা সে তার সকল মন্দ কার্য পরিহার পূর্বক রবের কার্য সু-সুম্পন্ন করে থাকেন। একটু দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে চাই তা হল হয়রত মূসা (আঃ) এর সময় আবাদানের নিকট হয়রত মুসা কালিমুল্লাহকে আল্লাহ পাঠালেন যাকে প্রচলিত ভাব ধারায় হয়রত খিজির (আঃ) বলে পরিচিত। কোরানুল মাজিদে উল্লেখ লকব হল আবাদান তাই আবাদান উল্লেখ করলাম।

ঘটনা প্রবাহঃ- মুসা নবী তাঁর ভাই হারুন কে সঙ্গে নিয়ে আবাদানের উদ্দেশ্যে দুই সুমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে রওনা দিল। তাদের ব্যাগে একটি মরা মাছ দুই সুমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে যাইতে যাইতে হঠাৎ মুসা নবী ক্লান্ত অনুভব করছিল । তাই তার ভাই হারুনকে বলল আমরা এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেই কিছু সময় পর আবার পুনরায় যাত্রা শুরু করব। মূসা (আঃ) তন্দ্রা অবনত কিন্তু হারুন জাগ্রত এমন অবস্থায় মাছটি জ্যান্ত হয়ে রওনা শুরু করে দিল। কিছু সময় পর মুসা (আঃ) পুনরায় ভাই হারুনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর যাবার পর ব্যাগে মাছটির অবস্থা দেখতে উদ্যত হল কিন্তু দেখে ব্যাগে মাছ নেই।

ভাই হারুনকে জিজ্ঞাসা করল হারুন বলিল মাছ তো আপনি যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেখান দিয়ে চলে গেছে তাহারা পুনরায় ফিরে এসে মাছের যাত্রা পথের দিকে মুসা (আঃ) রওনা দিলেন। আর ওখান থেকে হারুনকে বিদায় করে দিলেন। কিছু দূর যাবার পর মুসা (আঃ) কে আবাদান বলে উঠল আপনি মুসা? আপনি আমার জ্ঞানের তারতম্য বুঝতে চেয়েছেন বা জানতে চেয়েছেন কিন্তু আপনিতো ধৈর্য ধারন করতে পারবেন না। মুসা (আঃ) বলেন আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলতার মধ্যে পাবেন। আবাদান বলিল ঠিক আছে আপনি তিন বার ধৈর্য্যের ত্রুটি ঘটালে আপনার রাস্তায় আপনি আর আমার রাস্তায় আমি। শর্ত হলো আমার কোন কর্মে প্রশ্ন করতে পারিবেন না। শর্ত মোতাবেক উভয়ে যাত্রা শুরু করিলেন। পথের মধ্যে একটি নদী পারাপারের জন্য উভয়ই একটি নৌকাতে উঠল। নৌকার মাঝি হয়রত মুসা (আঃ) এর উম্মত হওয়ায় তিনি মহা খুশি তার নবীকে সে নৌকাতে পার করতে পারছে। মাঝা মাঝিতে নদীতে গমন কালে মাঝি হযরত মুসা (আঃ) কে বলিল হুজুর এই নৌকা চালনা করিয়া আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই হুজুর আমার জন্য আপনি দোয়া করবেন। এমন প্রার্থনাতে হয়রত মুসা (আঃ) আবাদানকে বলে হুজুর আপনিতো শুনলেন সব এবার একটু দোয়া করে দিন। আবাদান বলে দোয়া করে দিব? মুসা (আঃ) বলে হাঁ বলতে বলতে নৌকা ঘাটের নিকটে আবাদান তাঁর হাতের আশা বা লাঠি দ্বারা সজোরে আঘাত করে নৌকাটির তলাটি ছিদ্র করে দিল। আস্তে আস্তে নৌকাটি ডুবে গেল তারা কিনারায় পৌঁছালেন। এমন ঘটনা দেখে মুসা (আঃ) আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। একবার ধৈর্যচ্যুতির কথা বলে আবাদান পুনরায় যাত্রা শুরু করল। যাইতে যাইতে লোকালয়ের কাছে একটি মাঠে কিছু বালক খেলা করছিল। তার মধ্য হইতে একটি বালককে ধরে সজোরে আঘাত করল কিছু সময়ের মধ্যে বালকটি মারা গেল। এহেন ঘটনা দেখে মুসা (আঃ) স্থীর থাকতে পারলনা ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটাল। আবাদান ২য় বার চ্যূতি হয়েছে বলে পুনরায় রওনা দিল। যাইতে যাইতে একটি পুরাতন বাড়ীতে উপণীত হল এবং জল পান করার আকুতি জানাল। বাড়ীরলোক জল খাবার থেকে নিরুৎসাহিত করল এবং বিদায় নিতে বলল। ফিরে আসার সময় খেয়াল করল আবাদান একটি প্রাচীর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেটা মেরামতের জন্য উদ্যত হল এহেন কার্য দেখে মুসা (আঃ) ধৈর্য্য ধারণ করতে ব্যর্থ হল।

এমন পর্যায়ে আবাদান বলিল তিনবার শর্ত ভঙ্গের কারণ সম্পন্ন হয়েছে এবার এই কার্য্য সম্পন্ন হলে এই কারণ গুলো ব্যাখ্যা সহ জেনে আপনার রাস্তায় আপনি গমন করুন আর আমাকে আমার মত চলতে দিন। কার্য শেষ হল। এবার আবাদান নৌকা ফুটো করার কারণ জানালেন যে ঐ রাজ্যটা শাসন করে জালুত নামে এক জালিম রাজা। তার রাজ্যের নৌকার বহর করে বের হলে নদী এলাকায় যত নতুন নৌকা পাওয়া যায় তা তারা নিয়ে যায় আর ফেরত দেয় না। সে কারণে আমাকে দোয়া করতে বলায় আমি হাতের আশা বা লাঠি দ্বারা আঘাত করে ফুটো করে দেই তাতে নৌকাটি ডুবে যায় পরে বহর চলে গেলে আপনার উম্মত অল্প কিছু মুদ্রা খরচ করে তা মেরামত করে পুনরায় জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। বলুন কার্যত ঠিক করেছি কি না? মুসা (আঃ) বলেন আপনি উত্তম কার্য করেছেন। দ্বিতীয়ত যে বালকটির কথা তা হলো এই বালকটির পিতা এবং মাতা উভয়ই মমিন কিন্তু বালকটি জালেম হবে। তাই মুমিনের আশ্রিত ব্যবস্থা থেকে জালিমকে সরায়ে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ রাখলাম, তিনি যেন তাদের ঔরসে একটি নেক সন্তান দান করেন। বলুন কার্যত ঠিক করিনি? মুসা (আঃ) বলে আপনি উত্তম কাজ করেছেন। ৩য় যে বাড়ীর প্রাচীর সারলাম এই বাড়ীতে দুই জন এতিম রয়েছে এদের হক এই প্রাচীরের নিচে গুপ্ত অবস্থায় লুকানো রয়েছে কিন্তু যে ভাবে ইহা চুর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে তাতে তারা সাবালক হবার পূর্বেই দৃষ্টি গোচর হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় এই বাড়ীর প্রাচীরের কার্যটুকু সম্পন্ন করলাম। যেন তাদের হক তারা পায় কার্যত ঠিক করিনি? এবার মুসা (আঃ) বলে আপনি উত্তম করেছেন। এবার আবাদান বলে আপনার রাস্তায় আপনি আর আমার রাস্তায় আমি। মুসা (আঃ) নবী হবার পরেও আবাদানের কার্য ও বিবেচ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় বুঝতে অসুবিধা ঘটে। তাই আল্লাহর এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যে সাধনার দ্বারা এ সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তা মূলত ওলিদের ভাষায় মূলহেমার নফসের অধিকারীরা পেয়ে থাকেন। যা সামাজিক এবং যুক্তিযুক্ত বিষয়ের পরিপন্থি নাও হতে পারে। উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা তা অনুমেয়। দয়াল সবাইকে বুঝবার তৌফিক দান করুন।

৫। নফসে রহমানীয়া ঃ-

ওলীদের ভাষায় মুলত এই নফসের অধিকারীগণ কে মওলার সান্ধিধ্যে মিশ্রিত রুপে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিভাষায় সালাত দায়েমী, কায়েমী, মধ্যবর্তী সকল প্রকার সালাতের পূর্ণতা অর্জন কারীগণ এই মূলহেমার নফস থেকে সে নফসে রহমানিয়াতে পৌঁছায়। আরো একটু বিশেষভাবে উল্লেখ রাখতে চাই তা হল আল্লাহর রহিম নামের যে দয়া বা দান প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নফসে রহমানী বলা যায়। এতদ প্রসংগে পবিত্র কোরানুল মাজিদে সূরা বাকারা আয়াত নং ১৩৮ ছিবাগাতাল্লাহি ওয়া মান আহসানু ফি ছিবাগাতাও ওয়া নাহনু লাহু আ বিদুন। অর্থ আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং, রং-এ আল্লাহর চেয়ে কে বেশী সুন্দর আমরা তাঁরই এবাদত করি। তাখাল্লাকুবে আখলাকিল্লাহ (হাদীস একারনেহ) অর্থ আল্লাহর গুনে গুনান্নীত, আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানান্নীত, আল্লাহর শানে শানান্নীত হও। পবিত্র কোরানে সূরা তীনের চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ (৯৫:৪) “লাকাদ খালাকানাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম” অর্থ সত্যই মানুষকে অত্যুত্তম সুন্দর সংগঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। আয়াতে কারিমা এবং হাদিস খানা পাঠকের বিবেচ্য বিষয়ের ধারণার জন্য মেলে ধরা হল। এক কথায় মওলা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই নফসের অর্থাৎ নফসে রহমানীয়ার উপযুক্ততা অর্জণ করে। এরাই জগতে পূর্ণতার মানব হিসাবে স্বীকৃতি সনদ পেয়ে থাকে। উত্তম মানব হিসাবে নিজেকে তৈরী করার স্বার্থকতা বহন করে বা আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

আল্লাহ কি দোস্ব মুক্ত নয় ?

মহান সৃষ্টি কর্তাকে আমরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আল্লাহ, গড, হরি বিভিন্ন সন্মোধনে ডেকে থাকি এবং এও বিশ্বাস করি তিনি একজনই, তাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই জানি। একটি প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয় তা হল চলমান জীবন ব্যবস্থায় মানুষ স্বভাবত আল্লাহ কে দোষারোপ করে থাকে। যেমন একটি পরিবারে ছোট একটি নবজাতক জন্ম নিল এবং কিছু দিন পর তা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করল এমন পর্যায়ভূক্ত অবস্থায় বলা হয় আল্লাহ দিয়েছিল একটি সন্তান তাও আবার নিয়ে নিল। এখানে আল্লাহ দোষের ভাগে আরোপিত আমরা জানি সূরা এখলাছে উল্লেখ, তিনি কাউকে জন্ম দেন না আবার কারো কাছ থেকে জন্ম নেন না। তা হলে এমন বলা সাংঘর্ষিক কিনা? ভাবতে গেলে এর সদুত্তর পাওয়া দূরুহ হয়ে পরে। আবার চলমান ব্যবস্থায় দূর্ঘটনা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন বিভিন্ন ভাবে মানুষের দুরবস্থার সৃষ্টি হয় তখনও মানুষ বলে থাকে আল্লাহর দেওয়া এই দুর্যোগে আমার এত বড় ক্ষতি সাধন হয়ে গেল। এতেও আল্লাহ দোষের ভাগে পড়ে। চলমান দুনিয়াতে মহামারী করোনা ভাইরাস নামে একটি অনুজীব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের প্রাণহানি সহ বিপন্ন জনগোষ্ঠিতে পরিনত হতে চলেছে। অনেকে এ প্রসঙ্গে বলে থাকে আল্লাহ গজব দিয়েছে উক্ত গজবে এমন বিপর্যয়। প্রশ্ন জাগে যে আসলে কি আল্লাহ এমন কার্য করেন? পূর্ববর্তী নবীদের জামানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবের পূর্বাভাস এবং আল্লাহ মুখী না হবার কারণে নবীদের মাধ্যমে পূর্বে জানান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মানুষের মধ্য হইতে মানুষকে প্রতিনিধির ধারা চলমান। অথচ এ বিষয়ে কোন আগাম সকর্ততার উল্লেখ বা প্রকাশ পাওয়া যায় না। যদিও ওলিদের সীমিত গন্ডিতে কিছু কিছু প্রকাশ, যা জন সাধারণের জন্য অবগত হবার মত নয়। প্রশ্ন জাগে এটা কি আল্লাহর দেওয়া গজব? বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা হওয়ায় কিছুটা আগাম সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাই, তবুও তা অপ্রতুল সমস্যার নিরিখে। এ পর্যন্ত যত মরন অস্ত্র পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে যা দ্বারা প্রতিটি দেশ নিজেদেরকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান বলে মেলে ধরেছে। তা মানব জাতির জন্য অকল্যাণকর এবং এই সুন্দর পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে দেখা যায় মানব বিধ্বংসী ব্যবস্থাই শাসকদের সম্মানিত করে চলেছে। এহেন ব্যবস্থা পত্র প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির যথাযথ কার্যক্রমের সার্থকতা বিনষ্ট করে চলেছে। প্রকৃতির নিজেস্বতা আজ হারাতে বসেছে, সকল কৃত্তিম ব্যবস্থা পত্রের দ্বারা প্রকৃতিকে সাজানোর চেষ্টা চলছে। একটু গভীর ভাবে ভাবলে দেখা যায় বায়ু মন্ডলের অনুপাত ও ভারসাম্য মাটির গুণাগুণ ও মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ প্রকৃতির সংগে সংমিশ্রন ঘটায়ে এই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে চলেছে অথচ অন্ধ বিশ্বাসের মত মহান আল্লাহকে দোষারোপ করা কোন ভাবেই কাম্য নয় বলে মনে করি। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহা মানবদের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণীয় করে জীবন গড়াই শ্রেয় ব্যবস্থা বলে জানি। আসলে মহাপুরুষগণের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায় জীবের প্রতি দয়া, মানুষের প্রতি প্রেম এবং উত্তম আদর্শের বাস্তবায়নের ধারাতে তারা পৃথিবীবাসীকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। অথচ আমরা তা থেকে আজ মুখ ফিরায়ে নিয়েছি। যুক্তি আর চালাকীর দ্বারা নিজের সুখ ও ভোগ বিলাস রচনায় মত্ত। অথচ মুখে শুধু আদর্শের বুলি, এহেন অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ জরুরী বলে খ্যাত করি। আমাদের মুল কার্য থাকে আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করা, ধর্মের মূল কার্য এবং উপলব্ধি কার্যত ফলপ্রসু করবার মূল হাতিয়ার হল আধ্যাত্মিকতা। তাই এ আলোকে একটু আলোচনা করতে চাই । তবে জাগতিক যে সকল বিষয় উপস্থাপন রাখলাম চিন্তাশীলদের জন্য একটু ঈশারা। ইসলাম ধর্ম মতে প্রথম মানব বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) উভয়কে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখা হল। এবং গন্ধম খাইতে নিষেধ করা হইল এই গন্ধম রূপক আকারে (কুলবৃক্ষ) সহ বিভিন্ন রূপক বর্ণনায় ভরপুর। প্রকৃত পক্ষে আসলে এই গন্ধম অর্থ যৌন মিলনকেই বুঝানো হয়েছে। এদিকে সৃষ্টির বিকাশময় ধারাতে বাবা আদম (আঃ) এর ভিতরে আল্লাহ থেকে স্থানান্তরিত পবিত্র সত্ত্বা। তাই বাবা আদম (আঃ) দেখতে পেলেন গন্ধম খাওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির বিকাশময় ধারার অবতাড়না হবে কিন্তু দোষের ভাগটা আল্লাহ নিবে না। যদিও মা হাওয়া (আঃ) আদম থেকে আর একটি রুপান্তর সৃষ্টি, তাঁর দর্শন ও কাছাকাছি। আল্লাহর নিষেধ, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কার্যকর পাবে এটা ব্যবহার হলে।

অপর দিকে ইবলিস বা অহংকারী সত্ত্বা যার পূর্বের নাম আজাজিল, তিনিও বিশুদ্ধ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মালাইকাত (ফেরেশতা) রাজ্যের ইমাম নিযুক্ত হয়েছিল। শুধু মাত্র একটি আদেশ অমান্য করার জন্য তাকে লানত দেওয়া হল এবং ইবলিশে রূপান্তর করা হল। তাই ইবলিশ মোরাকাবা মোশাহেদাতে গিয়ে দেখতে পেল বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) গন্ধম ভক্ষনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রকাশ ও বিকাশ কিন্তু আল্লাহ দোষ নিবেন না। বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) সদ্য পূত:পবিত্র সত্ত্বা হতে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা থেকে রহিত হইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তিনি দুনিয়াতে খলিফা নিযুক্ত করবেন। তাহলে এই কার্য সম্পন্ন করার জন্য আমি ব্যতীত কেউ দৃশ্যমান নেই। তার মধ্যে বারবার আল্লাহর ইচ্ছা দুনিয়াতে খলিফা তৈরী করবে কিন্তু দোষ নিবে না। তাই ইবলিশ সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কোন মুল্যে এই কার্য সম্পন্ন করায়ে দিতে হবে এবং তা সম্পন্ন হল। এতদ প্রসঙ্গে বাবা সামসে তাব্রীজ (আঃ) যিনি মাওলানা জালাল উদ্দীন্ রুমীর পীর ও মোর্শেদ কেবলা উনি বলেছেন তোমরা ভাই আজাজিল কে গালি দিওনা, বল আলাইহেস সালাতুস সালাম অনেক জ্ঞানীগণের লিখনিতে উঠে এসেছে এ প্রসঙ্গে। আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, এই প্রাণ দিয়ে সঁপেছি এই দেহমন প্রাণ। তাই এই নিষেধ অমান্য করার ধারা থেকেই এই সৃষ্টির ক্রমবর্ধমান বিকাশময় ধারা চলমান আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণতা ফলাতে সকল শাস্তি এবং দোষ মাথা পেতে গ্রহণ করায় পূর্ণতা হয়েছে। তারপরও মহান আল্লাহকে দোষারোপের ভাগে ফেলেনি। তিনি পুতঃ পবিত্র সত্ত্বার মূল্যায়ন ও কার্যকর রেখেছে। অথচ আমাদের সামান্য একটু বন্যার কারণে মাছের ঘেরটা ভেষে গেলে বলে থাকি আল্লাহ ভাষায়ে দিয়েছে। এই অযৌক্তিক ভাবনা এবং প্রকাশ হতে আমাদের কে উত্তরণ জরুরী বলে মনে করি। যা ভালো এবং কল্যাণকর তা সৃষ্টি কর্তার সমীপে উপস্থাপন এবং যা অকল্যাণকর তা নিজের নফসের দায়বদ্ধতায় নিয়ে তা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যদিও পবিত্র কোরানুল মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে কারিমায় উল্লেখ তিনিই হাঁসান তিনিই কাঁদান। ভাল এবং মন্দ দ্বারা তিনি পরীক্ষা করেন।

প্রয়োগ পদ্ধতি বিবেচনার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করতে হবে কোন আয়াতে করিমা কোন লকব ধারির উপর নির্দেশনা মুলক উপস্থাপন হয়েছে? তা নিরিক্ষান্তে কার্যকরিতার দিকে ধাবিত হতে হবে। যেমন আমানু, ইনসান, নাস, মোমিন, মুত্তাকী, সাবেরীন, মুহসিনিন, আবাদান, বাসার ইত্যাদি। আমানুর জন্য যে নির্দেশ নামা বহন করে তা সমগ্র কোরানে অন্য লকবে উল্লেখ নাই বা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এটা একটি রহস্যময় গ্রন্থও বটে। পর্যায়ভূক্ত ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজের দেহ ভান্ডের উপর প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন না করার কারণে এমন প্রকাশের অবতাড়না বলে মনে করি। এ জন্যই হয়ত দোষের ভাগটা পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রকাশ হল এই যে কিছু লকব এর উল্লেখ দেখিয়েছি, এমন আরও অনেক লকব উল্লেখিত গ্রন্থে রয়েছে সকল ধারা চলমান ব্যবস্থায় বুঝবার জন্য এহেন অবস্থা তৈরীর একটি কারণ বলে মনে করি। তাই বিজ্ঞ মাশায়েখগন বলে থাকেন যে কোরান এসেছে অহির মাধ্যম দ্বারা আর একে বুঝতে হবে এলহামের দ্বারা। যদিও বিষয়টি আধ্যাত্মিক তবুও সার্বজনীন ব্যবস্থার বিরূপ ভাবধারা উত্তরণের জন্য উপস্থাপন রাখা। যেমন কোরান সুন্দর উপস্থাপন দ্বারা জানান দিতেছে যে মুতাককায়াতের আয়াত সমূহে পরবর্তী আয়াতে মুত্তাকিন লকবের উল্লেখ দেখতে পাই। সাধারন ভাবে অর্থ করা হয় যে এর উত্তর আল্লাহই ভাল জানেন। একটু মন্দ স্বত্ত্বার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা সূরা লাহাবে উল্লেখ, আবু লাহাবের দুই হাত কর্তন করা হোক ভাববাদী ব্যবস্থায় সর্বকালে সর্বযুগেই এই লাহাব মার্কা সত্ত্বা মানুষের মধ্যে বিরাজিত তা থেকে উত্তরণ করবার বা কার্যকর ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবার নির্দেশনামাই এই পবিত্র সূরাটির যথার্থতা বহন করে। কিন্তু বাস্তবতা যে কেমন তা একটু বলি, কিছু দিন পূর্বে বাড়ির নিকটেই একটি মাদ্রাসাতে ওয়াজ মাহফিলে একজন বক্তা বয়ান করছে। তিনি হজ্বে গমন করে আবু লাহাবের বাড়ীতে পায়খানা করে এসেছেন। ওখানে পায়খানা তৈরী করা হয়েছে এমন মুখরোচক বয়ান আর হাসির ফুয়ারার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেন। আমার মধ্যে বার বার উঁকি দিতে ছিল যে এই সূরাতুল লাহাব্ দ্বারা আনুষ্ঠানিক সালাত কার্য সম্পন্ন চলমান। বিষয়টি জ্ঞানীগণের ভাববার জন্য উল্লেখ রাখলাম। আর নিজেকে সংবরণ করে সিদ্ধান্ত নিলাম এহেন মোল্লাদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

আরও একটি উল্লেখ রাখতে চাই তা হল চলমান পবিত্র কালাম পাকে মোশরেকদের অর্ন্তভূক্ত না হবার জন্য নির্দেশ করেছেন। এতদ প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আঃ) এর সময়ে ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছিল নীল নদে। পৃথিবীবাসী আজও তার লাশকে মমি করে রেখেছে। যা দেখে দুনিয়ার মানুষ ঘৃণা পোষণ করে আর এমন স্বভাব হতে রহিত হতে চেষ্টা করে। সালাতে মিরাজ-দর্শন, একত্রিতভূতন, হওয়ার বিষয়ে এই সকল আয়াতে কারিমার প্রয়োগ কার্যত সুন্দর হয় না বলে মনে করি। প্রসঙ্গত আল্লাহ দোষমুক্ত নিয়ে আলোচনাতে সামান্য কিছু উদাহারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন রাখলাম। এবার কথাতে আলোচনা রাখি তা হল মুলত একেশ্বরবাদীতে এক মাত্র মাবুদের সান্নিয্যে নিজেকে লীন করে কার্যকারিতা ফলানোর মধ্যেই কেবল মাত্র মাহান আল্লাহ দোষমুক্ত অবস্থায় বিরাজিত বলে মনে করি তা ছাড়া দৈতনিতীতে দোষমুক্ত অবস্থার প্রকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে সাধক বাউল ফকির লালন শাঁইজি উল্লেখ করেছেন তার রচনাতে, “পাপ-পূণ্যের কথা আমি কাহারে জিগাই” এই গানে সাধক সূক্ষ্ম জ্ঞানে চেয়ে দেখো পাপ পূণ্যের নাই বালাই উল্লেখ করেছেন তাই সুক্ষ্মতার স্তর হল একেশ্বরবাদ ব্যবস্থা এখানেই মুলত কালামের পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে। এবং মহান আল্লাহ পাক দোষমুক্ত অবয়বে কার্যত বিস্তৃত ঘটে। অর্থাৎ একেশ্বরবাদীর নীতির আলোকে মূলত ইখলাস প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বিষয়টি পরিস্কার ধরা পড়বে। হাদিসে কুদসিতে উল্লেখ, বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আমার এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যে তার কান আমার কান যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ আমার চোখ যা দ্বারা সে দেখে, এমন কি তার পা আমার পা হয়ে যায় যা দ্বারা সে হাঁটা চলা করে (সংক্ষিপ্ত)। জগতে অনেক ওলিগণ এমন প্রকাশের কারণে দুনিয়াতে শাস্তিতে সমাসীন হয়েছে। বাবা মুনসুর হাল্লাজ (আঃ) বলেছেন, আনাল হক, বাবা জুনায়েদ বোগদাদী বলেন লাইসালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তালা, এমন অনেক উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু বিষয়গুলো রূপক আকারে হয়ে থাকে। কারন সবাই এ বিষয়ে অবগত না হওয়ায় বিরূপ ব্যবস্থাপত্র চলে আসে। কারণ হল ফানাফিল্লাহ এর স্তর এবং বাকাবিল্লাহতে অবস্থান করা একজন মানব আর সাধারণ নাম ধারণ করা মানুষের মধ্যে অনেক তফাৎ। মূলের ধারাতে অবস্থান করা একজন মানুষকে সবাই বুঝতে পারে না।

এজন্য হয়ত ভুল করে বসে কিন্তু তার মূলধারার কর্মকান্ড মূলত দুনিয়াতে স্বাক্ষর বহন করে দুনিয়া থেকে তা কখনোই বিলুপ্ত বা নিঃশেষ হয় না। এ ভাবেই আল্লাহর ওলিরা নিজেদেরকে স্থায়ী আসনে বসিয়েছেন যে কারণে তারা অমর, তারা চিরঞ্জীব হিসাবে দুনিয়াতে সাক্ষতা রেখেছে। মহান আল্লাহ সহায় হউন। মুলের ধারা বুঝবার তৌফিক দান করুণ।

মওলা আলী (আঃ) পদত্ত খোৎবা

জুলুম ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে

আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি এবং শয়তানের প্রতারণামূলক কর্মকান্ডের শাস্তি থেকে তাঁর সাহায্য এবং শয়তানের দুরভিসন্ধি (ফাঁদ) ও ওতপাতা থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল। মুহাম্মদের বৈশিষ্ট্য কারো সাথে তুলনীয় নয় এবং তাঁকে হারানোর ক্ষতি কখনো পূরণীয় নয়। জনবসতিপূর্ণ স্থানসমূহ তাঁর মাধ্যমে আলোকিত হয়েছিল। সেসব স্থান পূর্বে গোমরাহির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সেসব স্থানে ছিলো সর্বগ্রাসী অজ্ঞতা ও রূঢ় আচরণ এবং মানুষ হারামকে হালাল মনে করতো, জ্ঞানীদেরকে অপমানিত করতো, পথ প্রদর্শকবিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতো ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতো।

হে আরবের জনগণ, তোমরা বিপর্যয়ের শিকার হবে যা সন্নিকটে রয়েছে। তোমরা সম্পদের নেশা পরিহার কর, খোশগল্পের আড্ডার সময় নষ্ট করার বিপদকে ভয় কর, ফেতনা-ফ্যাসাদের অন্ধকার ও বক্রতায় নিজেদেরকে সুদৃঢ় ও শক্ত রাখো। যখন ফেতনার গুপ্ত প্রকৃতি তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়, তখন গোপনীয় বিষয় সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং এর আবর্তনের অক্ষরেখা ও কিলক শক্তি সঞ্চার করে। এটা নগণ্য অবস্থা থেকে শুরু হয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থায় উন্নীত হয়। প্রারম্ভে এটা কিশোরের মতো হলেও এর আঘাত প্রস্তরাঘাতের মতো বেদনাদায়ক।

অত্যাচারীগণ (পরস্পর) চুক্তির ভিত্তিতে এর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। তাদের প্রথম জন পরবর্তীগণের জন্য নেতা হিসাবে কাজ করে এবং পরবর্তীগণ প্রথমজনকে অনুসরণ করে। তারা ঘৃণ্য দুনিয়া নিয়ে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং পুঁতিগন্ধময় এ শবদেহের (দুনিয়া) ওপর লাফিয়ে পড়ে। সহসাই অনুসারীগণ নেতার সাথে চুক্তি বাতিল ঘোষণা করবে এবং নেতাও অনুসারীর সাথে। পারস্পরিক কারণে তাদের মধ্যে থাকবে অনৈক্য এবং একের সাথে অপরের দেখা হলে অভিসম্পাত দেবে। এরপর এমন এক ফেতনাবাজের আবির্ভাব ঘটবে যে বিনষ্ট জিনিস ধ্বংস করে দেবে। স্বাভাবিক স্পন্দনপ্রাপ্ত হৃদয় আবার কম্পিত হবে, নিরাপত্তার পর মানুষ আবার বিপথগামী হবে, কামনা- বাসনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বহুমুখী হয়ে পড়বে এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

এ সময়ের ফেতনার দিকে যে এগিয়ে যাবে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং যে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তাকে খতম করে দেয়া হবে। বন্য গাধা যেভাবে পালের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে তারাও নিজেদের মধ্যে তদ্রূপ কামড়া-কামড়ি করবে। রশির গোলাকার চক্র (সত্য ও ন্যায়) এলোমেলো হয়ে যাবে এবং কর্মকান্ডের বাহ্যিক দিকে সকলেই অন্ধ হয়ে থাকবে। এসময় জ্ঞান ও বোধশক্তিতে ভাটা পড়বে এবং জালেমগণই শুধু কথা বলার সুযোগ পাবে। এ ফেতনা তার হাতুড়ি দিয়ে বেদুইনদেরকে বিচূর্ণ করে ফেলবে এবং তার বক্ষ দ্বারা তাদেরকে পিষে ফেলবে। এর গুঁড়োর মধ্যে একজন পদব্রজক ডুবে যাবে এবং এর পথে একজন অশ্বারোহী ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিয়ে এটা আসবে এবং (দুধের পরিবর্তে) তাজা রক্ত দেবে। এটা ইমানের মিনার ভেঙ্গে ফেলবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের বন্ধন চুর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। জ্ঞানীরা এটা থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে, অন্যায়কারীরা এর পৃষ্ঠপোষক হবে। এটা বজ্রের মতো গর্জন করবে এবং বিজলীর মতো চমকাবে। এটা নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। এতে আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইসলাম পরিত্যাক্ত হবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থা অস্বীকার করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং যে ব্যক্তি এটা থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে তাকে এতে থাকতে বাধ্য করা হবে।

তাদের মধ্যে কতেক প্রতিশোধবিহীন অবস্থায় শহিদ হবে এবং কতেক ভয়ে আতঙ্কিত হবে ও আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তারা প্রতিশ্রুতি ও ইমানের ভান দ্বারা প্রতারিত হবে। তোমরা ফেতনা ও বিদা'তের নিশানবরদার হয়ো না। তোমরা সেপথ মেনে চলো যার ওপর উম্মাহ্‌র বন্ধন ও আনুগত্যের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। মজলুম হিসাবে তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়ো এবং জালেম হিসাবে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ো না। শয়তানের পথ আর বিদ্রোহের স্থান এড়িয়ে চলো। তোমাদের পেটে হারাম খাদ্যকণা ঢুকিয়ো না, কারণ তোমরা তাঁর সম্মুখীন হচ্ছো যিনি অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন এবং আনুগত্যের পথকে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

★★★★★

চেরাগে জান শরীফ

ডা. কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর এর সূরাতুল লাহাব অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সাম্য বাদের এক জীবন্ত দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার উপস্থাপন যা পাঠক হৃদয়কে এক আধ্যাত্মিক জগতের অনুপেরনা যোগাবে। তাই পাঠকের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন রাখরাম।

সূরা লাহাব

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

১. তাব্বাত্‌ ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা।
২. মা আগনা আনহু মালুহু ওয়ামা কাসাবা।
৩. সাইয়াস্‌ সালা নারান্‌ জাতা লাহাবিউ অম্‌রতুহু।
৪. হাম্‌মা লাতাল্‌ হাতাবে।
৫. ফি জিদিহা হাবলুম মিম্‌ মাসাদ।

অনুবাদ

১. আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হোক এবং উহা ধ্বংসই।
২. তার ধন ও তার উপার্জন তার কোনো উপকারেই আসে না।
৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে জ্বলবে।
৪. আর জ্বলবে তার স্ত্রী জ্বালানি কাঠ বহনকারিনী।
৫. খেজুর পাতার দড়ি তার গলায় জড়িয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা

এই সূরাতে হুজুর পাককে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। ঠিক তেমনি আবু লাহাবকে দেখানো হয়েছে অন্যায়-অবিচার এবং সত্যকে বাধাদানকারীর প্রতীকরূপে। সে সর্বদাই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক (মেটিরিয়াল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল) সত্যের বিকাশের প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। আবু লাহাব জাতীয় মানুষ বাস করে জাহান্নামে (ফিউচার টেন্স তথা ভবিষ্যত কাল ব্যবহার করা হয় নি তথা জাহান্নামে যাবে বলা হয় নি)। তার স্বভাব ও কার্যকলাপগুলো নিজেরাই জাহান্নামে বাস করার খোরাক তথা ইন্ধন। আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পাবে যে, তার আমলগুলোর দ্বারাই তথা কার্যকলাপের দ্বারা সে জাহান্নামে তথা দুনিয়াতেই ছিল এবং দ্বীনে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল। কাজেই দেখা যায়, জালেম লোক জাহান্নামেই বাস করে। শুধু দৃষ্টি হতে পর্দা সরে না যাবার কারণে আমরা উহা বুঝে উঠতে পারি না। এটুকুই যা প্রভেদ। এই কারণেই এই সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, 'ওয়াতাব্বা' অর্থাৎ "এবং উহা ধ্বংসই"।

সত্য ও অসত্য এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য হতে অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদের শিক্ষা দিচ্ছে কোরান। যেন আমরা অসত্য, অন্যায় হতে সাবধান থাকি এবং ভুলেও উহার প্রশ্রয় না দেই। যারা আবু লাহাবের মতো জালেম তারা ধ্বংস হোক তথা ধংস করে দেবার মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলার আদর্শকে আমাদের মনের উপর জাগ্রত প্রহরীর মতো স্থিতিমান রাখার মহান চেতনায় সজাগ প্রহরী হবার শিক্ষা দিচ্ছে কোরান। তারপর বলা হয়েছে যে, আবু লাহাব জাতীয় এক শ্রেণীর জালেমেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতেই আছে। যদিও আমরা তাহা দুনিয়ার কলুষ মাখানো দৃষ্টির জন্য বুঝে উঠতে পারি না। মজলুম জনতার জীবনপথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে বিরাট ও মহান শিক্ষা রয়েছে এই সূরার প্রথম আয়াতটি তারই একটি জ্বলন্ত নজির।

সমাজ জীবনে জালেমদেরকে অভিশাপ দেবার অর্থই হলো তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মনোভাব নিয়ে চলার নির্দেশ। ভুলেও যেন মুহূর্তের জন্য জালেমদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে না ফেলি। এই জন্যই এরূপ অভিশাপ দেবার নির্দেশ রাখা হয়েছে।

এখানে আবু লাহাব বলতে ব্যক্তি আবু লাহাবকে বোঝানো হয় নি, বারং শ্রেণী আবু লাহাবকেই বোঝানো হয়েছে, যে আবু লাহাবের উদয় যুগে যুগে মানবসমাজের প্রত্যেক অংশে বিভিন্ন রূপে ও গন্ধে বিরাজ করে। তার এই অকল্যাণের মূর্তি আমরা দেখতে পাই সব রকম বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্রে।

ব্যাক্তি আবু লাহাব এবং শ্রেণী আবু লাহাবদের ধ্বংস কামনা শুধু যে আমরা মানুষেরাই করবো তা নয়, বরং কোরান নিজেই এই ধ্বংস কামনা করে। অর্থাৎ ইহা কোরান-এরই বিধান তথা বিশ্ব প্রকৃতির বিধান যে, এই আবু লাহাব শ্রেণীর লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েই চলছে, কিন্তু তা আমরা অন্ধ দুনিয়ার দৃষ্টির কারণে বুঝতে পারি না। আবু লাহাব শ্রেণীর যারা, তাদের সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টা এবং উপার্জন ব্যর্থ। কারণ শীঘ্রই অর্থাৎ দুনিয়া সরে গেলেই তারা অনুশোচনার লেলিহান অগ্নিশিখায় প্রবেশ করবে।

তারপর আসলো তার স্ত্রী-প্রসঙ্গ। যারা ভালবাসবে আবু লাহাব শ্রেণীর লোকদেরকে এবং তাদের সহযোগিতা করবে, তারাও এই একই শ্রেণীভুক্ত। যে কার্যাবলি ও আমল তারা করে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে, ঐগুলোই তাদের দোজখের ইন্ধন। দুনিয়ায় অবস্থানকালে এই ইন্ধনসমূহের জ্বালা দৃষ্টিগোচর না হলেও অতি শীঘ্রই দ্বীনে প্রবেশ করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের ঘাড়ে সেই অগ্নির বোঝাই বহন করছে। আর তাহা এমনভাবে তাদের গলদেশে দড়ির মতো জড়িয়ে পড়বে যে, উহা তারা ত্যাগ করতে পারবে না।

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হুজুর পাকের (আ.) বিরুদ্ধে যেরূপ অন্যায় আচরণ করতো উহার মূলে ছিল হিংসা এবং কর্তৃত্বের মোহ। সকল যুগেই দেখা যায় যে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের হীন স্বার্থ এবং ক্ষমতার কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য সমাজসেবী কল্যাণকামী লোকদের বিরুদ্ধে হিংসামূলক আচরণ করে থাকে। যদিও তারা বেশ জানে যে, যাদের বিরুদ্ধাচারণ তারা করছে তারা প্রকৃতই মহান জনদরদী।

'আবু লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হওয়া'-র অর্থ অন্যায় শক্তির ধ্বংস কামনা করা তথা অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। অন্যায়কারী অনুতপ্ত হয়ে সংশোধিত হলে তার ধ্বংসের কোনো দরকার হয় না।

সে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করে তার তওবা তথা অনুতাপ ও সত্যপথে প্রত্যাবর্তন করার কারণে। এই জন্য 'আবু লাহাব ধ্বংস হোক', এ কথা না বলে 'আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হোক' এ কথা বলা হয়েছে। কারণ হাত দুটো শক্তির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। যদিও আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হবার সাথে সাথেই সেও ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী, যে তার হাতকে অন্যায় করার ইন্ধন যোগাতো, সেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, পাপ কখনো ধারণারূপে বিরাজ করে না। পাপ আরোপিত হয় অখণ্ড একক সত্তার বিবর্তিত খণ্ড সত্তা একমাত্র মানব ও জীন নামক জাতির অন্তরে। তাই পাপের ডিপো আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ধ্বংস হয়েছে এবং ধ্বংস করে দিতে বলা হয়েছে।

মন্তব্য

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো এবং উহা ধ্বংসই' কোরান পাকের এই বাণীতে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আবু লাহাব তো আর ইহজগতে নেই, দেড় হাজার বছর আগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তবে তাকে আর 'ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হাত দুটো' বলার মাঝে কী সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু এর উত্তর, ব্যক্তি আবু লাহাব নয়, আবু লাহাবদের শ্রেণীগতভাবে ধ্বংস হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যক্তি মীরজাফরকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকরূপে আমরা ব্যবহার করি এবং তার ধ্বংস কামনা করি, সে রকম আবু লাহাবকে জালেম অত্যাচারীর প্রতীকরূপে ব্যবহার করে আবু লাহাবদের শ্রেণীচরিত্রকে ধ্বংস হয়ে যাবার কামনা করতে বলা হয়েছে। মহাপুরুষরা যেমন এক-একটি যুগে আগমন করে মানবতার আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করে যান এবং মানবতা প্রতিষ্ঠার তরে নিজের স্বল্প জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে যান, সে রকম আবু লাহাবেরাও যুগে যুগে আগমন করবে এবং মানবতার বিরুদ্ধে মতবাদ তথা জুলুম অত্যাচারের বন্যা বয়ে দিয়ে যাবে। তাই এই আবু লাহাব শ্রেণীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন আমরা তথা মজলুম জনতা সদা-সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি তথা তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি তারই সংকল্প গ্রহণ করতে বলেছেন পাক কোরান তথা অত্যাচার, অবিচারের বিষবৃক্ষ যারা মানবসমাজে বুনে দেয় ও দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের আবেদন ও আদেশ দিয়েছেন পাক কোরান।

আবু লাহাবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মাঝে আপাতদৃষ্টিতে নির্মম বলে মনে হলেও ইহা মোটেই নির্মমতা নয়, যদিও আবু লাহাবদের চোখে এবং যারা তাদের অত্যাচার করার লাকড়ি যোগাড় করে তথা আবু লাহাবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে তাদের দৃষ্টিতে ইহা নির্মম বর্বরতা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ বলেই মনে হবে এবং মজলুম জনতাকে ভুল পথে পরিচালনা করার

জন্য স্ত্রী উজ্জারা, তথা আবু লাহাবদের পা-চাটার দল, উঠে পড়ে লাগবে।

ব্যক্তি আবু লাহাবকে অত্যাচার করতে সহায়তা করেছিল তারই স্ত্রী উজ্জা তাই স্ত্রী উজ্জাকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হয়েছে তথা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং শ্রেণী আবু লাহাবদের যারা ব্যক্তি আবু লাহাবের স্ত্রী উজ্জার মতো অত্যাচার করার তরে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে তাদেরকেও সমুচিত শিক্ষা দেবার উপদেশ দিচ্ছে পাক কোরান। শ্রেণী আবু লাহাবদের অত্যাচারের হস্তকে যারা সুদৃঢ় করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায় তারা প্রত্যক্ষ আবু লাহাব না হলেও পরোক্ষভাবে একই শ্রেণীর এবং এই একই শ্রেণীভুক্ত বলেই ব্যক্তি আবু লাহাবের সঙ্গে স্ত্রী উজ্জাকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছে। স্ত্রী যেমন স্বামীর কর্মপ্রেরণায় উৎসাহ এবং সহায়তা করে সে রকম শ্রেণী আবু লাহাবকেও যারা অত্যাচার করার লাকড়ি যোগাড় করে তথা সহায়তা করে তারা তো স্ত্রীর মতোই, যদিও আধুনিক ভাষায় এই শ্রেণীর স্ত্রীদেরকে দালাল, বাটপার, পা চাটা কুকুর বলে থাকে এবং গ্রাম্য ভাষায় এদেরকে বলা হয় বেদের পোষা খাঁচার ডাহুক।

অবশ্য আজকের এই আধুনিক যুগে স্ত্রী উজ্জার মতো যারা শ্রেণী আবু লাহাবদের দালালি করে গোটা সমাজ জীবনকে একটা বিরাট ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে চেনাও মজলুম জনতার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত দালাল ডাহুকেরা যে কত রকম পোশাক বদলাতে পারে এবং কত রকমে যে মজলুম জনতার দৃঢ় ঐক্যের মাঝে শত শত ফাটল তৈরি করে যার দরুণ মজলুমের সংগ্রাম ও বিপ্লব সফলতা অর্জন করে বহুদিনের অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনার পর। ডাহুক-ধরা বেদে জানে যে, ঝোপ-জঙ্গলের স্বাধীন ডাহুকেরা বেদের মুখ দেখে ধরা দেবে না। কারণ, ডাহুক-ধরা বেদে এদের শ্রেণীভুক্ত ডাহুক নয়। সে অন্য জীব তথা মানুষ। তাই বেদের মুখ দেখলে ঝোপের ডাহুকদল পালিয়ে যায়।

বেদে তখন মনে মনে ফন্দি আঁটে আর এই ফন্দির ফলস্বরূপ বেদে একটি ডাহুককে খাঁচায় পুরে আপন জনের মতো খাদ্য দিয়ে লালন-পালন করে। যখন খাঁচার ডাহুক বেদের পোষ মেনে নেয় এবং বেদের শেখানো আকার-ইঙ্গিত রপ্ত করে ফেলে তখনই বেদের বুকে আশার সঞ্চার হয়। খাঁচায় আবদ্ধ পোষা ডাহুকটিকে নিয়ে বেদে তখন ডাহুককুলের আড্ডাখানায় তথা ঝোপ-জঙ্গলের এক কোণে রেখে দেয় এবং চার ধারে পেতে রাখে মরণ ফাঁদ, যাকে ফালা বলা হয়। পোষা ডাহুক মনিবের শেখানো আকার-ইঙ্গিতগুলো আপন মনে ঠোঁটের কোণে সুর করে ভাজতে থাকে। বেদে বহু দূরে চুপ করে লুকিয়ে থাকে। ঝোপের ডাহুকেরা সহসা চমকে ওঠে, চমকে ওঠে তাদেরই দলের তাদেরই শ্রেণীভুক্ত আর একটি ডাহুকের করুণ কান্নায়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে ডাহুককুল ঝোপের ভেতর। তাই তারা সংসারের মায়া বোঝে, বোঝে অপরের বেদনা। নিজেদের সুখে তারা নিজেরাই গর্বিত, নিজেরাই আনন্দিত, সংসারের সকলে মিলেই তারা আনন্দের গান গেয়ে একে অপরকে সুখের কথা জানায়, কিন্তু সহসা কে এমনিভাবে একাকী কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে? কী তার ব্যথা? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ডাহুককুলের কিছুসংখ্যক ডাহুক এগিয়ে আসে পোষা ডাহুকটির কাছে। পোষা ডাহুকটি তাদের দেখে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ঝোপের ডাহুক অতি কাছে এসে যখন পোষা ডাহুকটিকে মুক্ত করে দিতে চায় তখন সে বুঝতে পারে যে, মরণফাঁদের ভেতর সেও চিরদিনের তরে আটকে গেছে। পাখার ঝাপটা ঝাপটিতেও আর নিজেকে মরণফাঁদ হতে মুক্ত করতে পারে না। আর এমনি মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্য একটি জীবকে তথা বেদেকে দেখতে পায়, যে তাদের পাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে খাঁচার পোষা ডাহুকটিও। কত বড় প্রতারণা কত বড় জঘন্য বাটপারি কী বিশ্রী বিশ্বাসঘাতকতা! একই জাতের, একই শ্রেণীর, একই পালকে মোড়া দেহ। অথচ কত ব্যবধান।

সাবধান করে দিচ্ছে পাক কোরান মজলুম জনতাকে। সাবধান করে দিচ্ছে স্ত্রী উজ্জার মতো শ্রেণী আবু লাহাবদের, যারা বেদের পোষা ডাহুকের মতো মায়াকান্না কেঁদে মজলুম জনতাকে মরণফাঁদে ফেলতে চাইছে।

যারা বেদের পোষা ডাহুকের মতো মানব সমাজের মাঝে বিচরণ করে সাম্য-মৈত্রীর ভিৎ গড়ার সংগ্রাম আর মহৎ চেতনাকে বিকৃত করছে তাদেরকেই পাক কোরান অন্যত্র মুনাফেক বলেছেন। ঐ পোষা ডাহুকের মতো একই পোশাকে সজ্জিত, একই পালকে মোড়া দেহ, গরিব সর্বহারার মতো মলিন বসনে আবৃত, গরিব সর্বহারার বেদনায় সে-ও কাঁদে, সে-ও প্রতিকার চায়, মুক্তি চায়- কিন্তু আবু লাহাব শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে নয়, সমুচিত শিক্ষা দিয়ে নয়, বিপবী চেতনায় জেহাদি মনোবল নিয়ে নয়। ধনী-গরিবকে একই বিছানায় কলেরা রুগীর সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তিটিকে শান্তিতে নিশিযাপন করার পন্ডিতি দর্শনে, যুক্তি আর সূক্ষ্ম বচন ঠাঁটের বাগবিভূতির তেলেসমাতি চিন্তাধারার জগা খিচুড়ি পাকিয়ে, ব্যক্তিমালিকানার (ব্যক্তি-আমানতের কথা বলে নয়) ডুগডুগি হাতে নিয়ে বাঁদর নাচানোর মতো শোষকদের শোষণ করার স্বাধীনতার উপর কবর রচনা করে নয়, ব্যক্তির মালিকানা উচ্ছেদ করে আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে সকলে মিলে, রাষ্ট্রীয় আমানতের মাধ্যমে নয়।

ব্যক্তি আবু লাহাব, আবু জাহেল, এজিদ আর মারোয়ান ইহজগতে নেই। দেড় হাজার বছর আগে কালের কয়টি দিবসের নাটক মঞ্চের বিশ্রী অভিনয় মানুষের দৃষ্টি হতে মুছে গেছে, কিন্তু স্মৃতির পাতায় যুগে যুগে স্বাক্ষর হয়ে থাকবে কলঙ্কের আবর্জনায়। কিন্তু ব্যক্তি আবু লাহাবদের প্রেতাত্মা মানুষের দেহধারণ করে যুগে যুগে ভর করে থাকবে। তাই পাক কোরান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, সাবধান করে দিচ্ছে, সমুচিৎ শিক্ষা দিতে উৎসাহ দিচ্ছে এই ছোট্ট লাহাব সূরাটিতে।

বাক্তি মীরজাফর, মোহাম্মদি বেগ, ইয়ার লতিফ, উমি চাঁদ আর এই মূর্ত্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় করতে আসবে না, কিন্তু মর্ত্যের নাটক চলার গতির মাঝে তারা বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় কীভাবে করতে হয় তা অনাগত কালের নতুন মীরজাফর, মোহাম্মদি বেগ, ইয়ার লতিফ, উমি চাঁদদের শিক্ষাগ্রহণ করার ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই আজকের দিনে যারা মজলুম জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে মীরজাফরি করে বেড়াচ্ছে তাদেরকে হেদায়েত করতে বলছেন পাক কোরান।

আমরা শিক্ষা দিতে না পারলেও আল্লাহ এই পৃথিবীতেই এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে যান, অথচ অনেকেই সেসব খবর রাখি না। বেইমান মীরজাফর কুষ্ঠ রোগে হাতের মাংস খসে পড়া গন্ধ বেরিয়েছিল এবং পেশাব করার সময় ঠাটা পড়ে মারা যান। মোহাম্মদি বেগ বদ্ধ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত এমন কি পায়খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো এবং অবশেষে একটি কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইয়ার লতিফ, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায় কে বা কারা নদীতে নিক্ষেপ করার পর লাশ ভেসে উঠে এবং পানির অধিবাসীদের পেটে দেহ সৎকার হয়। লর্ড ক্লাইভের আত্মহত্যার কথাটা অনেকেই জানেন, কিন্তু ওয়ারেন হেসটিংস-এর করুণ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর খবরটা অনেকেই মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। জালেমদের এ রকম বহু নজির আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিয়ে যান কোনো না কোনো উছিলাতে, নির্মম বোবা ধীরগতি অথবা দ্রুতগতির শাস্তি দিয়ে এবং অনেক নজির বোধ হয় আমাদেরও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

ধর্মের লেবাসে, ঘোমটার জ্ঞানে

প্রিয় সুধী,

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে, গত ২২/৩/২০২৫ই; ঘটে যাওয়া দরবার শরীফ ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে তৌহিদী জনতার ব্যানারে। কিছুদিন আগে সুইডেনে পবিত্র কুরআন পোড়ানো এবং পবিত্র কুরআন অবমাননা করার জন্য যখন মুসলিম বিশ্ব একযোগে প্রতিবাদ এবং নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে অথচ লেবাসে তৌহিদী জনতা কোরআন পোড়ায়ে উল্লাস করে। হায়রে মুসলিম! হায়রে জাতির বিবেক! অনেকেই বলে আরবী লেখা নাই এটা আবার কোরআন নাকি? অথচ শুধু বাংলা নয় শাহ সুফি সদর উদ্দীন আহমেদ চিশতি লিখিত কোরআন দর্শনে চোখ বুলায়ে দেখুন, সেখানে আরবি আছে কি না। মব ভায়োলেন্স এর পাল্লায় মানুষের বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলেছে। সুফি কবি নজরুল বলেছেন, আল্লাতে যে পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান। তাঁহার লিখা মানুষ কবিতাটি সত্যিই অনেক জাগরণের চেতনা জোগায়। আমার মহান মোর্শেদ বলতেন, আমি কোরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা করি কেন? এর সদ উত্তর হলো মুসলিম পরিবারে জন্ম। আমি যদি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিতাম, তাহলে গবেষণা করতাম বেদ,গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি। কিন্তু সুরা লুকমানে দেখি, জন্ম দেবার মালিক একমাত্র আল্লাহ। (সংক্ষিপ্ত) তাই গবেষণা হলো ঘোমটার আবরণ ভেদ করে নিরেট সত্যটা উন্মোচন করা। সাধারণ এর ভেদ বুঝবে না। তাই সাধারণকে ব্যবহার করেই ধর্মের ফায়দা হাসিল করে এক শ্রেনীর ধর্ম ব্যবসায়ী বা মোল্লা তন্ত্র। সুইডেনে কোরান পোড়ানো অন্যায় এটা মুসলিম হৃদয়ে আঘাত করে আর দরবার মাজারে হামলা করে কোরান পোড়ানো ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে, হায়রে নামের মুসলিম কবে আনবে ঈমান! মুর্শিদকে নির্ণয় করো, তাঁর কাছে ঈমান আনো।

প্রিয় পাঠক, মব ভায়োলেন্স বা মব জাস্টিস সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়। এটা এখন জাতির জন্য এক বিরাট অভিশাপ হিসাবে প্রচলন হতে চলেছে। মব অর্থ হলো উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল, হুজুগে জন সাধারণ, ইতর জন সাধারণ, দাঙ্গাহাঙ্গামা কারী অসভ্য জনতা, বিবেচনাবোধহীন জনতা, হুজুগে উগ্র নিজস্ব বিশ্বাসে অন্ধ জনতা ইত্যাদি। জাস্টিস বা ভায়োলেন্স হলো - উক্ত বিষয়ের বিচার বা কার্য সম্পাদনে অর্থাৎ আইনের তোয়াক্কা না করে নিজেরাই বিচার সম্পন্ন করে। এমন কার্য দেখা যায় বাংলার প্রতিটি প্রান্তে প্রায়ই ঘটে চলেছে। ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। কিশোর থেকে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত এ কাজে শামিল হচ্ছে। জাতি সচেতনতা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্র যাত্রায় এহেন কার্য জাতির বিবেককে প্রশ্ন বিদ্ধ করে চলেছে যা সত্যই কষ্টদায়ক।

গ্রামদেশে একটি কথা প্রচলন আছে তা হলো, হুজুগে বাঙালি। এখন কথা হলো দেশ পরিচালনা হয় মানুষের তৈরী করা মতবাদের উপর অথচ এক শ্রেণীর ধর্মবেত্তাগণ লেবাস ধারণ করে আল্লার আইন প্রতিষ্ঠার ফিরিস্তি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে মেলে ধরেন এবং জনগণকে বোকা বানিয়ে ফায়দা হাসিল করে শান-মান বৃদ্ধির একটি ধর্ম চর্চা জন্মগতভাবে দেখে চলেছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আল্লাহর আইনের একটি হরফও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলাম না। কিন্তু এই প্রকার অনুশীলনগত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার এতোটাই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা পেয়েছে, যা অন্য কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় তা হয়নি। কিন্তু মানুষের মানবিক পরিবর্তনের চাইতে বিপর্যয় বেশি লক্ষণীয় যা জাতির বিবেককে ভাবিয়ে তোলে। অদূর ভবিষ্যতে এর আরও কি ভয়াবহতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে? সময়ই এ বিষয়ে জাতিকে বুঝিয়ে দেবে। টুপি, পাঞ্জাবি, দাঁড়ি রাখা, চুল ছোট ও ন্যাড়া করা, টাকনুর উপরে কাপড় পরিধান, মেসওয়াক করা, ঢিলা কুলুপ ইত্যাদি এই চর্চার নিয়মতান্ত্রিক সূচনা। কিন্তু এই পোশাকী সভ্যতা আামাদেরকে কি উপহার দিয়ে চলেছে বিগত এক বছরের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ভাবলে জাতির বিবেক তার সদুত্তর পাবে বলে মনে করি।

হুজুর পাক (সা:) (আ:) নবুয়্যত প্রচার কার্য শুরু থেকে যাহারা উনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছেন তাদেরকে মহব্বত, ইশক্, প্রেম এই শিক্ষাগুলির মধ্যে সেই আজকের সবচাইতে সুন্দরতম ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। নবুয়্যতকালে আপন হিসাবে সাহাবাগণ তাঁর একনিষ্ঠতা এবং মোহাব্বত দ্বারা সর্ব বিষয়ে সাথী হয়েছেন। প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহে জীবন দানেও পিছুপা হননি। অথচ আজকের জামানায় ধর্মের চর্চার নামে আমরা কি দেখছি?

একদা হুজুর পাক (সা:)(আ:) মাওলা আলীর উরুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় আসরের নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, মাওলা আলী কিছু বলতে পারছেন না কারণ নামাজের চাইতে নবীর বিশ্রামটা এখানে বড়ো। সূর্য প্রায় অস্ত যাবার পথে আসছে রসুল(সা:)(আ:) উঠলেন এবং বললেন আলী তুমি আসরের সালাত আদায় করবে? আলী বললেন, এ সময় নামাজ আদায় কি সমিচীন। রসূল (সা:)(আ:) দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তোমার আলী আসরের নামাজ আদায় করবে সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। কিছু সময়ের জন্য সূর্য ফেরত হয়ে গেল এবং আলী নামাজ আদায় করলেন, এটা প্রিয় নবিজীর একটি মোজেজা। প্রকাশিত হাদিসের আলোকে একনিষ্ঠতা, মহব্বত, প্রেম দ্বারা আল্লাহ প্রাপ্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যার কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়।

তাই রসূলের আকিদা যাঁরা হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁদের আর বৈষয়িক ব্যবস্থাপত্র স্বাদহীন হতে শুরু করে। এ ভাবেই শিক্ষা চর্চার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ইসলামের খাদেম বা প্রতিনিধি হিসাবে জগতে খেদমত চর্চা করে চলেছেন। তাঁদের কোথায় পাবো? একটু ভাববাদী দৃষ্টি মেলে ধরলে দেখা যায়, গুরুবাদী বা পীর-আওলিয়া প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলো হুজুর পাক (সা:)(আ:) এর কার্যের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু জাগতিক লেবাসধারী চর্চার যে ইসলাম এখানে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও এই মহব্বত, আকিদা, প্রেম এগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমার মোরশেদ বলতেন, বাবা জ্ঞান দুই প্রকার, একটা মেজাজী অপরটি হাকিকী। মেজাজী জ্ঞান দ্বারা আল্লা পাওয়া যায় না। হাকিকী জ্ঞান দ্বারা তালাশ করতে হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, মাথার জ্ঞান এবং সিনার জ্ঞান প্রকৃত আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে তাকে অবশ্যই সিনার জ্ঞান হাসিল করতে হবে। নচেৎ সে প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। আর এই সিনার জ্ঞান দুনিয়ার কোন বই-পুস্তক কাগজ কালির দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় অলীদের দরবারে বছরের পর বছর ধরে ধ্যান-সাধনা বা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে মোরশেদের রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হলে সে এই সিনার জ্ঞান এর দরজা লাভ করতে পারে। এজন্য মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই দ্বার উন্মুক্ত করে সে অলীতে সমাসীন হয়।

বিষয়গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে চলমান সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থানকৃত উপস্থাপন এবং কিছুটা প্রকৃত বা মূল, সমাজের জন্য কার্য করেন, তা উপস্থাপনের চেষ্টা করে গেলাম।

প্রিয় পাঠক, বিষয়গুলো নিজের বিবেক দ্বারা ভাবুন এবং সঠিক সিদ্ধান্তটি নিজেই নির্বাচন করুন, এই আহবানটুকু রেখেই মহান মাওলার কাছে আর্জি, উনি যেন সত্য লাভে সহায়ক হয়। (আমিন)

শাহ সুফি বাবা শরীফ আল জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর অবয়বকে স্মৃতির পাতায় তুলে রাখলাম।

শুরুতেই দক্ষিণ এশিয়ার সেই মহান অলী হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হুব্বুল্লা সুলতানুল হিন্দ হিন্দাল অলী আতায়ে রাসূল গরীবে নেওয়াজ ইয়া সৈয়দ মাওলানা মঈন উদ্দিন হাসান সানজারী আল হোসাইনী ওয়াল হাসানী (আ:) তিনি প্রায়ই তাঁর একনিষ্ঠ আশেক (ভক্তের) জন্য দোয়া করতেন যার নাম অনেকের অজানা। খাজা বাবা বলতেন, বনেই ফুটেছিল বনেই মিলিয়ে রইল, তিনি হলেন বাবা র‌্যাংরেজ (আ:)। এমন আদর্শ লালন করেই শরীফ আল জাহাঙ্গীর চলতেন। মোর্শেদ খেলাফত প্রদান করার পর থেকেই আমার নিকট দরবারের সকল কার্য ভক্ত বৃন্দকে সাথে নিয়ে পরিচালনা করতেন। অনেক সময় সমস্যা হলে বলতো বাবা আপনি বললেই তো হয়ে যায়। আমার নিজের ভক্তেরও এমন বিশ্বাস দেখি না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবা তোমাকে খেলাফত দিয়েছে তুমি মুরিদ করতে পারো। ও বলতো বাবা নিজেকে পীরের গুণ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত ঐ দিকে যেতে চাইনা। আপনি না রাখতে চাইলে বলে দিয়েন। আমি বলতাম এ দরবার তুমিই পরিচালনা করো আমিতো শুধু কিছু নির্দেশনামা দিয়ে থাকি। বাবার এবং নিজের লেখা বইগুলো যতটুকু বিস্তার লাভ করিয়েছে এই শরীফই। তাই তাঁর চলে যাওয়া ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৪ ইং এর পর ২২শে মার্চ ২০২৫ ইং উগ্রবাদীদের হামলায় দরবার ভাংচুর হয়। শরীফের কর্ম ব্যবস্থা দরবারের প্রতিটি জায়গায় স্মৃতি হয়েছিল যা এখন শুধু স্মৃতিই। দয়াল মোরশেদ তাকে কল্যাণ দান করুন,এমন প্রত্যাশা সবসময় করি।

(দয়াল সহায়)

দাগী
(রবিউল আওয়াল উপলক্ষে)

কিভাবে বলি আমি উম্মতে মোহাম্মদী?
হে রসুল পারিনি আমি তোমার দ্বীনে রজ্জু হতে।

ঘুম ভাঙ্গে মোর বিষয় বাসনার চাওয়া নিয়ে
লালসার জিহবা দ্বারা স্বাদ গ্রহন করি।
ভবের নেশায় মন মজেছে, মুখে প্রকাশ
রাসুল আল্লার জয় জয়কার।। কিভাবে বলি............ঐ

আল আমিন হলো তোমার আদর্শ
মিথ্যার কাছে আমি সদাই পরাভূত।
মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু
সদাই আমি গীবতে লিপ্ত।। কিভাবে বলি................ঐ

সাধন-ভজন, মোরাকাবা, হেরা গুহার আদর্শ
মন বিবাগী বাঁধ সাধে মোর ভজন রসের।
সুখ-জ্বালাতে দেখাই ভালো, করি মন্দ
এই হলো মোর আরাধনা।। কিভাবে বলি।...............ঐ

নারী লোভী কামুক আমি, কাম ছাড়তে আদের্শ করি
সুদ, ঘুষ আর দূর্নীতি নিত্য আমার কর্ম নীতি।
এই নিয়ে আমি ধর্ম করি
মুখে প্রকাশ অমূল্য নিধি।। কিভাবে বলি................ঐ

পরের হক মারতে মানা, এহেন কার্যে সম্মাননা
এতিমের প্রতি সদয় হওয়া, এদেরকেই শোষণ করা।
পোশাকি ভবের আরাধনা, লোক ঠকানো আমার পেশা
দ্বীন কানা দেলোয়ারের সকল দায় জাহাঙ্গীরের পায়।।
কিভাবে বলি..ঐ

গান
আব্দুল গাফফার এর রচনাবালী

গান-১

তুমি সত্য চিরন্তন নিত্য নিরঞ্জন
মরনের পরেও তুমি ওগো জীলানী
সুলতানুল আম্বিয়া তুমি (২)......ঐ

তুমি অপলক হতে এলে ধরাতে
ভক্ত ত্বরাতে জীলানী রূপে
কত যোগী মনি ঋষি করে কদম বুচি
অন্তরও মাঝে তোমার আরতি..... ঐ

অন্তর মাঝে অন্তর্যামী
নিরাশার মাঝে মাবুদ তুমি আশার বাণী
তুমি অরুণ দ্যূতি মানব মনের জ্যোতি
ভক্তের হৃদয়ে তুমিই তপতী.....ঐ

ধরণীর বুকে তুমি ধরিত্রী
মানব হৃদয়ের তুমি সাবিত্রী খেয়া পারের তুমি খেয়াত্রী
ভক্তের মনোরথে হয়ে সারথী.....ঐ

আ'সমুদ্র হিমাচলে তোমারী মহিমা গাইছে সকলে
এ গুনাহগার গোলামও গাফফার
করুণা ভিক্ষা চায় যে তোমার
তুমি উদিত রবি ধ্যানেরও ছবি প্রণঃতুষ্ণীক দিবা করণী....ঐ

গান-২

তাজিল্লার জীলানী বাবা কামালাতের আয়না
সুলতানুল আম্বিয়া বাবার উপাধি খানা....ঐ

নূর জালালের জীলানীর সান
ঐ নামেরই উড়াও নিশান
অফি আন ফুসিকুম জান
সায়েরে আনফুসি হলে ভেদ যাবে জানা
বাবা কামালাতের আয়না....ঐ

মুতাওয়াজ জীহা ইলা জীহাতিল
কাবাতিস শরিফাতে মোকামে খুল্লাতে
জীলানীর আয়না বাবা কামালাতের আয়না.....ঐ

দেলোয়ার বলে গাফফার কানা
গো ভাগারে জ্ঞান থাকে না
গো ভাগারের কীট রে তোর জ্ঞান হবে না
বাবা কামালাতের আয়না.....ঐ

গান-৩

আশেকান জাকেরান শোন ভক্ত মুরিদান
পইরো না তরঙ্গে
না বুঝে মইজ না জীলানীর সঙ্গে.....ঐ

কামালাতে দয়ার সাগর
আসা জাতে উলিল আমর
জীলানীর ভেদ বুঝবি তোরা কেমনে
না বুঝে মইজ না জীলানীর সঙ্গে.... ঐ

স্থূল জগতের খেলা উলুল আমিরের ভ্যালা
ধারণ কর দেহ তরঙ্গে..... ঐ

দেলোয়ার বলে গাফফার ঠসা তোর
তরীর ভগ্ন দশা
কাম নদীতে বাইলি তরী রঙ্গ না বুঝে
মইজ না জীলানীর সঙ্গে.....ঐ

গান-৪

আল্লা রাসুল উলুল আমির
তিনের খবর এক সাথে
হায়াতুল মুরছালিন রাসুল বর্তমান ধরাতে....ঐ

অনুগত্য করো আল্লার এবং রাসুল আল্লার
শেষে উলুল আমির বলছে কালাম আয়াতে....ঐ

আল্লা না পাবো ধরাতে প্রচার শরার মতে
রাসুল হয়েছেন ওফাত রয়েছেন মদিনাতে..... ঐ

জামাত বদ্ধ জীবন যাপন
করো আমিরের নির্দেশ শ্রবণ
প্রয়োজনে হিজরত করো বলছে রাসুল উম্মতে
হায়াতুল মুরছালিন রাসুল বর্তমান ধরাতে.... ঐ

দেলোয়ারের এই মিনতি
আমির বিনা নাই রে গতি
যুগের আমির না চিনিলে
তার মরণ জাহিলিয়াতে
হায়াতুল মুরছালিন রাসুল বর্তমান ধরাতে....ঐ

গান-৫

তুমি শ্রবণ করো জীবন গড়ো
উলুল আমির ধারাতে..... ঐ

এ ধরা মাঝে, আমির বিরাজে
চিনিয়াছো কি তুমি তাহারে
কালামে এ কথা বলিছে এমনি
মানিয়া চলিবে আমিরের বাণী ....ঐ

কামনা বাসনা ইচ্ছা শক্তি
দাও তবো তারে বিলায়ে
বিনীত হইয়া করিবে প্রণিপাত
রহিবে না তোমার অনুতাপ.....ঐ

তার অবয়বে থাকিবে চাহিয়া
জাগরণের ধ্যানে রাখিবে ধরিয়া
করণে কারণে দ্বিধা বিভাজনে
বিফল হবে আমির ভজনে
এ হীন জ্ঞান কাম্য নহে সমর্পণের ধারাতে....ঐ

গান-৬

যেজন ধর্মের দাস
কর্মে তার হয় প্রকাশ
নশ্বর জগতে চুল ধরিয়া টানছো তুমি কোন পথে.... ঐ

সৃষ্টি ও স্রষ্টা দ্বৈত ভাব
তন অস্তিত্বে অস্তিত্বের আবির্ভাব
শুভ অশুভর উৎস হতে
বিশ্বাসে অবিশ্বাস থাকে এক সাথে...ঐ

উত্তম আদর্শ সৎ চরিত্র
আত্মার জাগরণে সৃষ্টি স্রেষ্ট
কামনা বাসনা রিপুরও যাতনা
নশ্বর জগতে চুল ধরিয়া....ঐ

অবতরণে প্রত্যার্বত আসা যাওয়া
চলছে বিলক্ষণ কর্ম ফল ভোগ
করিবে কখন,
অধম গাফফার বলে বিলক্ষণ
নশ্বর জগতে চুল ধরিয়া....ঐ

গান-৭

মনটা তোমার ইচ্ছা শক্তি
ছুটে চলে বিরাম হীন
গুরু ধ্যানে মন বসে না
ফাল পারে তিরিং বিরিং..... ঐ

মনের মাঝি দেহ গড়ে
পঞ্চ প্রাণে খেলা করে
ভাসমান সত্ত্বা তারা চলিতেছে
নিশি দিন গুরু ধ্যানে মন বসে না....ঐ

পঞ্চ প্রাণের সরোবরে কাম কামনা বসত করে
দর্শন আকাঙ্খা জাগে স্পর্শেতে রয় বিলিন.... ঐ

হিংসা ভরা ইচ্ছা শক্তি দেয়
পাহারা বুঝলি নারে দীনহীন..... ঐ

গান-৮

বিশ্বাসের কি মূল্য আছে
বাস্তবে না দেখিলে ভজোরে মুর্শিদের চরণে...ঐ

এলে তুমি এই ধরাতে কেউ ছিল না সাথে
বিবেক বুদ্ধি ইচ্ছে শক্তি ছিল না চৈতন্যে
ভজোরে মুর্শিদের চরণে.....ঐ

শিশু হতে যৌবনে এলে
বাড়ী গাড়ী সব চিনিলে
পুরুষ হয়ে নারী পেলে
কম হলো না মৈথুনে
ভজোরে মুর্শিদের চরণে....ঐ

কার্পণ্য দোষে আমি,
আমি না আমাকে চিনি।
উপহৃত হয়ে আমি ভুল করেছি না জেনে
ভজোরে মুর্শিদের চরণে.....ঐ

নিরানন্দ বায়ু ভূতে দেহ খাঁচায় কে বিরাজে
যে দেখেছে সে মজেছে
নিত্যনন্দে সন্‌ভু সনে
ভজোরে মুর্শিদের চরণে....ঐ

অধম গাফফার ভজন করে
দেলোয়ারের চরণ তলে
ইয়াও মুদ্দিনের ঘড়ে নিরাকার নিরঞ্জনে
ভজোরে মুর্শিদের চরণে.....ঐ

গান-৯

আমানু আর মমিনে
ভেদ বিধান না জেনে
ইমাম নির্বাচন করে কেমনে...ঐ

আমানুর ইমামতির নীরে অনুমতি
আমানু সালাত শেখে
যার সালাত কায়েম নয় সে আমানু হয়
কায়েমী সালাতে মমিন হয়
আমানু......................কেমনে...ঐ

কিতাবী জ্ঞান ভরা বলে সে ফাজেল পড়া
ইমাম হবে না তারা কোরান মতে
গ্রামের মুন্সি মাতব্বরে ইমাম নির্বাচন করে
মাসোয়ারা চুক্তি করে বছরে বছরে
আমানু.....................কেমনে...ঐ

মাসোয়ারা নেয় না মমিন
থাকে না কারো অধীন
মমিন সালাত শিখায়
কলবে মমিনের ঘড়ে
আল্লা থাকে বলে
মানব রূপে মমিন থাকে ধরায়
আমানু.............কেমনে...ঐ

ইমাম করেছে আল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লা
মানব জাতির উপরে
সেই ধারাতে বর্তমানে
ইমাম নির্বাচন হয় মমিনে
আমানু...........কেমনে...ঐ ।

গান-৮

১০/
ইলাহা হয় উপাস্য
দৃশ্য কি অদৃশ্য
জগৎ জোড়া দৃশ্য ঘেরা
দৃশ্য হয় কি উপাস্য.....ঐ

অদৃশ্য যা দেখা যায় না
অদেখায় উপাস্য হয় না
অন্ধ দেখে না দৃশ্য
কি হয় অন্ধের উপাস্য.....ঐ

ইলা রূপে নেতা কর্তা
কোন রূপেতে সৃষ্টি কর্তা
রূপ ছাড়া রূপ যায় না ধরা
নেতা কর্তা হয় অদৃশ্য.... ঐ

শ্রবন দর্শন ইন্দ্র ঘরি
মন ব্যাপারী লাগাম ধারী
রথী মোর প্রাণ পতি
বুদ্ধি সত্ত্বা হয় সারথী....ঐ

দেখে গাফফার বর্তমানে
জীলানী রয় দৃশ্যমানে
ভক্তি দাও তার চরণে গুপ্ত নয় প্রকাশ্য
ইলাহা................উপাস্য...ঐ

গান-৯

আমানু আর মমিনে
ভেদ বিধান না জেনে
ইমাম নির্বাচন করে কেমনে...ঐ

আমানুর ইমামতির নীরে অনুমতি
আমানু সালাত শেখে
যার সালাত দায়েম নয় সে আমানু নয়
দা   য়মী সালাতে মমিন হয়
আমা......................কেমনে...ঐ

কিতাবী জ্ঞান ভরা বলে সে ফাজেল পড়া
মাস হবে না ভারা কোরান মতে
গ্রামের মুন্সি মাতব্বরে ইমাম নির্বাচন করে
মাস যারা চুক্তি করে বছরে বছরে
আমানু.....................কেমনে...ঐ

মাস যারা নেয় না মমিন
থাকে না কারো অধীন
মমিন সালাত শিখায়
কলবে মমিনের ঘাড়ে
আল্লা থাকে বলে
মানব রূপে মমিন থাকে ধরায়
আমানু.............কেমনে...ঐ

ইমাম করেছে আল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লা
মানব জাতির উপরে
সেই ধরাতে বর্তমানে
ইমাম নির্বাচন হয় মমিনে
আমানু...........কেমনে...ঐ ।

গান-৮

ইলাহা হয় উপাস্য
দৃশ্য কি অদৃশ্য
জগৎ জোড়া দৃশ্য ঘেরা
দৃশ্য হয় কি উপাস্য.....ঐ

অদৃশ্য যা দেখা যায় না
অদেখায় উপাস্য হয় না
অন্ধ দেখে না দৃশ্য
কি হয় অন্ধের উপাস্য.....ঐ

ইলা রূপে নেতা কর্তা
কোন রূপেতে সৃষ্টি কর্তা
রূপ ছাড়া রূপ যায় না ধরা
নেতা কর্তা হয় অদৃশ্য.... ঐ

শ্রবন দর্শন ইন্দ্র খড়ি
মন ব্যাপারী কাগাম ধারী
রথী মোর প্রাণ পতি
বুদ্ধি সত্ত্বা হয় সারথী....ঐ

দেখে গাফফার বর্তমানে
জীলানী রয় দৃশ্যমানে
ভক্তি দাও তার চরণে গুপ্ত প্রকাশ্য
ইলাহা................উপাস্য...ঐ

জীলানী. জান শরীফ

বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরীর

রচিত গ্রন্থাবলী

১। আধ্যাত্মিক বিধান

২। আধ্যাত্মিক লিপি

৩। সেই সত্ত্বা

৪। আধ্যাত্মিক প্রদীপ্ত

৫। আধ্যাত্মিক হৃদয়।

যাদের সহায়তায় বইটি পাঠককুলের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ঃ

১। রিদয় উদ্দিন, কোমরপুর, দোগাছী, পাবনা।

২। মোঃ রিপন, কোমরপুর, দোগাছী, পাবনা।

৩। ডাঃ আব্দুস সালাম, রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৪। শাহ্‌নাজ পারভীন (বিউটি), রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৫। মোঃ মুকুল হোসেন, মর্শিন্দা, পাঁচবাড়ীয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

৬। মোছাঃ বেলী পারভীন, মর্শিন্দা, পাঁচবাড়ীয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

৭। সাবিনা ইয়াসমিন, পাবনা।

৮। ডাঃ মোঃ আবুল কালাম, চৌগাছা, গাংনী, মেহেরপুর।

৯। সুমাইয়া (সুমি), বড়ইপাড়া, টেবুনিয়া, পাবনা।

১০। মোঃ সবুজ হোসেন, কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

১১। মোঃ আবুল বাশার, লড়িবাটা, দোগাছী, পাবনা।

১২। মোঃ টনি, চবদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।

১৩। মোঃ নাসির হোসেন, মধুপুর, আতাইকুলা, পাবনা।

১৪। মোঃ লকমান হোসেন, হুদার পাড়া, তাঁতিবন্দ, পাবনা।

শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া গুরু বাদের একমাত্র কাজ

ইঞ্জিঃ বাবা দেলোয়ার হোসেন বা-গোলামে জাহাঙ্গীর আল্ সুরেশ্বরী।

বিঃদ্রঃ বিবৃতিতে সংকলিত কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রত্যাশা রইল।

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

★★★ প্রকাশিত বই ঃ ★★★

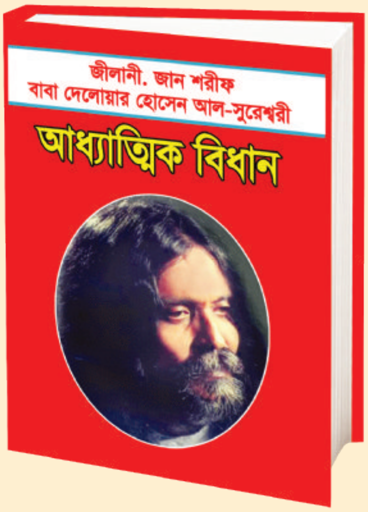

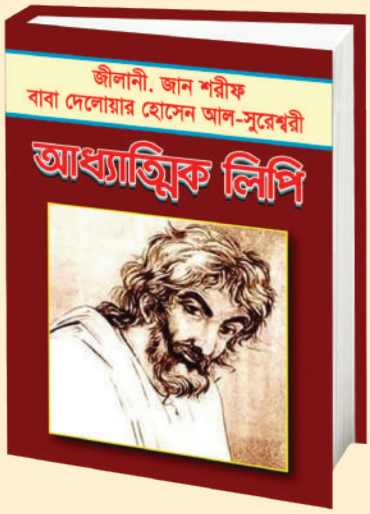

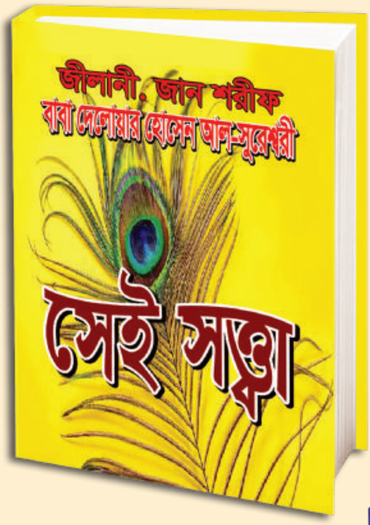

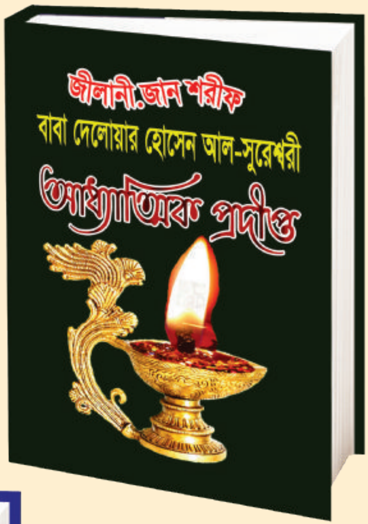

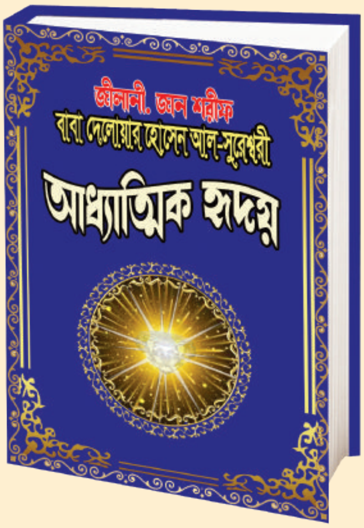

সারা দেশে বুকষ্টল ও অন্যান্ন বইয়ের দোকানে আপনাদের চাহিদা জানান।

www.babadeloyer.com YouTube : Baba Deloyer

Facebook Page: Facebook.com/page.BabaDeloyerSuressury